দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

সেদিন বাঙ্গালি হিন্দু লড়েছিল এক হয়ে
— পৃঃ ৬

ভারতীয় নবজাগরণের জনক লোকমান্য তিলক
— পৃঃ ২৪

৭২ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।। ১০ আগস্ট, ২০২০।। ২৫ শ্রাবণ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। পনেরই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

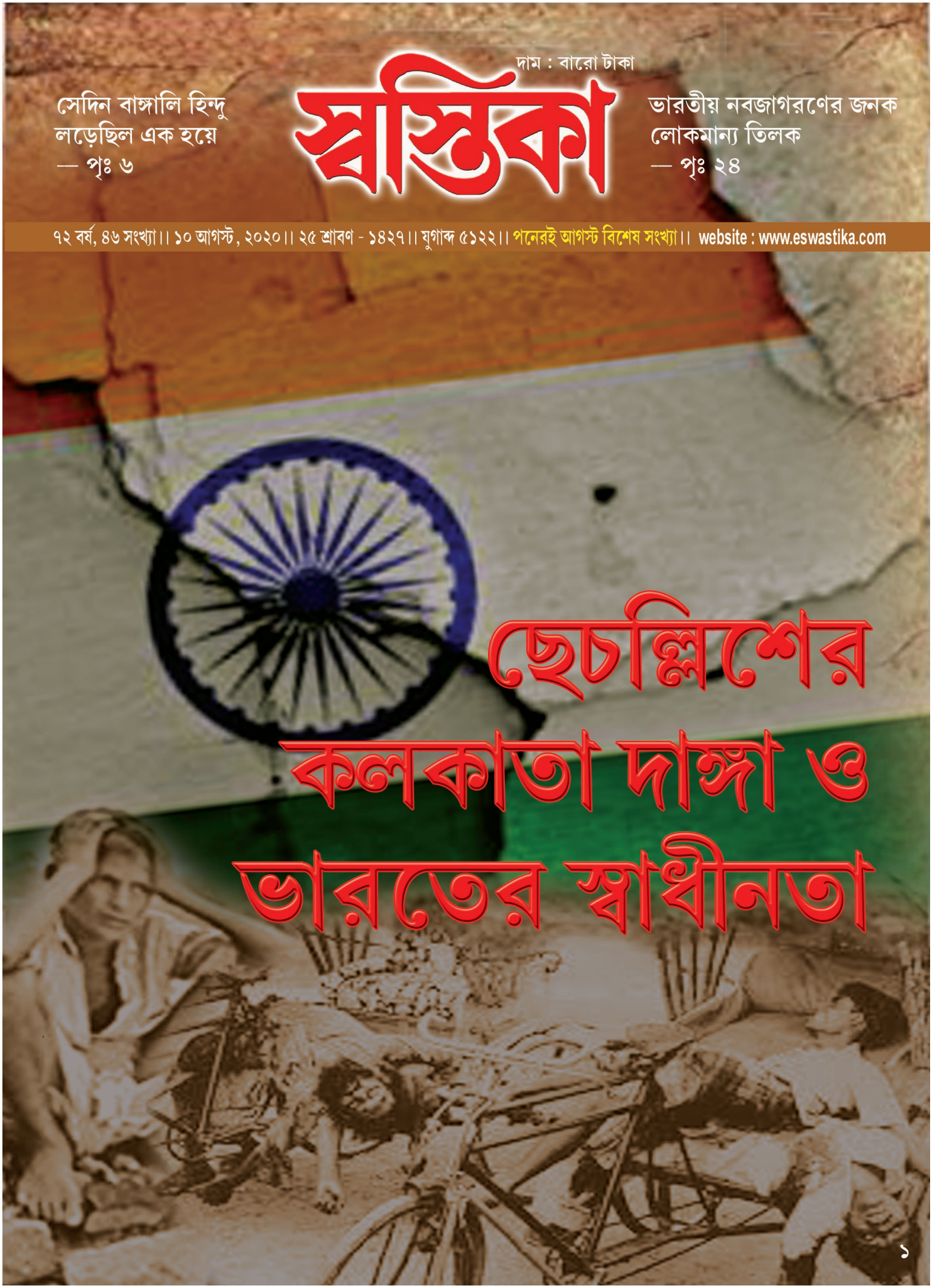

ছেচল্লিশের কলকাতা দাঙ্গা ও ভারতের স্বাধীনতা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

।। পনেরোই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।।

৭২ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ২৫ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১০ আগস্ট - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৩

ছেচল্লিশের সেই ভয়াবহ দিনগুলির কথা হিন্দু বাঙ্গালি ভুলতে পারে না ▯ প্রবীর ভট্টাচার্য ▯ ৪

সেদিন বাঙ্গালি হিন্দু লড়েছিল এক হয়ে ▯ বিজয় সিংহ ▯ ৬

ছেচল্লিশের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাঙ্গালি উলটে দিয়েছিল মুসলিম লিগের সব হিসেব-নিকেশ ▯ স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী ▯ ১০

ছেচল্লিশের বেদনা যেন স্মরণে থাকে শয়নে স্বপনে ▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ১৩

১৯৪৬-এর কলকাতা দাঙ্গা : ফিরে দেখা ▯ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৭

কোচবিহারকেও পাকিস্তানভুক্ত করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ২০

ভারতীয় নবজাগরণের নায়ক লোকমান্য তিলক ▯ বিনয় সহস্রবুদ্ধে ▯ ২৪

বাংলাদেশকে নিয়ে পাকিস্তানের খেলাটা ভয়ংকর ও বিপজ্জনক ▯ ২৬

বলিউড ও ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ▯ ডা: আর এন দাস ▯ ২৯

ভারতের নিজস্ব গুগুল, ফেসবুক সম্ভাবনা নাকি মরীচিকা ▯ জ্যোতিপ্রকাশ চ্যাটার্জি ▯ ৩২

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরিবর্তনের অনুভব ▯ বলরাম দাসরায় ▯ ৩৪

ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ঘটল ▯ ড: কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩৬

সব দেশেই হিন্দু কমরেডরা এক আজব চিজ ▯ শিতাংশু গুহ ▯ ৩৭

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষব্যবস্থার গঙ্গাজলি যাত্রা ▯ ড: নারায়ণ চক্রবর্তী ▯ ৩৮

ইতিহাসপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে ▯ দেবব্রত ঘোষ ▯ ৪০

শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব প্রশ্নাতীত ▯ দুর্গাপদ ঘোষ ▯ ৪৩

শায়রার টুপি : স্বনির্ভরতার প্রতীক ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ৪৫

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কলিকাতা ও নোয়াখালির হিন্দু নিধনকে ভুলিলে চলিবে না

শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরী বাঙ্গালিকে এক আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়াছেন। বাঙ্গালি সত্যিই এক আত্মবিস্মৃত জাতি। যে রক্তস্নাত অধ্যায়ের ভিতর দিয়া তাহাদের পূর্বপুরুষেরা পথ চলিয়াছেন, যেভাবে তাহাদের স্ত্রী-কন্যার সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে, পিতৃপুরুষের ভিটা হইতে বিতাড়িত হইয়া যেভাবে অসহায় অবস্থায় রেলস্টেশন অথবা শরণার্থী শিবিরে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিলেন— সেই কলঙ্কজনক এবং অশ্রুমেদুর ইতিহাস বাঙ্গালি সহজেই ভুলিয়াছে। পৃথিবীতে যেখানে যত নির্যাতিত জাতিগোষ্ঠী রহিয়াছে, তাহারা অতীতে তাহাদের উপর সংঘটিত হওয়া অত্যাচারের কাহিনি ভুলিয়া যায় নাই। বরং, পরবর্তী প্রজন্ম যাহাতে পূর্বপুরুষদের সেই দুঃখজনক অভিজ্ঞতাকে চিরকাল মনে রাখে এবং যে অপরাধী সকল তাহাদের পূর্বপুরুষদের উপর জঘন্য অত্যাচার সংঘটিত করিয়াছিল, তাহাদের যাহাতে ক্ষমা না করে— সেই কারণে সেই ইতিহাসকে যথাযথোভাবে লিপিবদ্ধ এবং সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতেও, বঙ্গপ্রদেশ ও পঞ্জাব প্রদেশ বিভাজনের ভিতর দিয়া স্বাধীনতা আসিয়াছে। বঙ্গ ও পঞ্জাব এই দুই প্রদেশে যথাক্রমে হিন্দু ও শিখেরা মহম্মদ আলি জিন্নাহর মুসলিম লিগের উন্মত্ত পিশাচস্বরূপ জেহাদি কর্মীদের অত্যাচারের শিকার হইয়াছিল। সেই বীভৎস অত্যাচারের স্মৃতি শিখেরা ভুলিয়া যায় নাই। অমৃতসরে তাহারা দেশভাগ সংক্রান্ত সংগ্রহশালা স্থাপন করিয়া পরবর্তী প্রজন্মকে অতীতের সেই দুঃখজনক স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। অত্যাচরিত হিন্দু বাঙ্গালি তাহা করে নাই। তাহারা অত্যাচারিত হইয়া পিতৃপুরুষের ভিটা এবং স্বজন পরিজন হারাইয়া এই পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া 'সেকুলার' সাজিয়াছে। অতীতকে বিস্মৃত হইবার যে পাপ, তাহার ফলস্বরূপ আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম জানিতেই পারে নাই। দেশকে জানিতে হইলে ইতিহাসকে জানিতেই হইবে। দেশভাগের প্রাক্‌লগ্নে বাঙ্গালি হিন্দুদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার নামিয়া আসিয়াছিল, তাহা ভুলিলে চলিবে না। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে মুসলিম লিগ কর্তৃক দশহাজার হিন্দু ও শিখ পুরুষ-রমণী-শিশুহত্যার সেই ভয়াবহ ঘটনাবলী স্মরণ করিতেই হইবে। স্মরণ করিতেই হইবে ওই বৎসরই অক্টোবর মাসে পূর্ববঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালিতে কয়েক হাজার হিন্দু নিধন এবং হিন্দু রমণীদের উপর বলাৎকারের ঘটনাবলীকে। এই ইতিহাস জানিতে পারিলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অপরাধীর প্রকৃত স্বরূপটিও চিনিতে পারিবে। আর প্রকৃত অপরাধীকে চিনিতে পারিলেই মাথা হইতে সেকুলার সাজিবার ভূতটিও বিদায় লইবে।

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটি এখন যে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়া চলিতেছে, তাহাতে দেশভাগের প্রাক্‌লগ্নের সেই বেদনাদায়ক দিনগুলিকে আবার স্মরণ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। গত এর দশকে এই পশ্চিমবঙ্গেও আবার ইসলামি মৌলবাদ ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বাঙ্গালি হিন্দুদের উপর আবার অত্যাচার নামিয়া আসিতেছে। ক্রমে ক্রমে দেশভাগের পূর্বের অবস্থারই সৃষ্টি হইতেছে। অতএব, অতীতের অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করিয়া এখন হইতেই আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। নতুবা কে বলিতে পারে, ভবিষ্যতে আবার স্বজন পরিজন হারাইয়া, আশ্রয়চ্যুত হইয়া আর একবার আমাদের স্থান হইবে না শরণার্থী শিবিরে?

সুভাষিতম্

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবসিত্যবদ্যম্

সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্‌ভজন্তে মূঢ় পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।। (মহাকবি কালিদাস)

পুরনো জিনিস সবসময় ভালো এবং নতুন জিনিস সব সময় খারাপ— এরকম ঠিক নয়। বিবেকবান ব্যক্তি বুদ্ধিবলে ভালোকে স্বীকার করেন এবং মূর্খেরা অন্যের কথামতো স্বীকার বা অস্বীকার করে।

ছেচল্লিশের সেই ভয়াবহ দিনগুলির কথা হিন্দু বাঙ্গালি ভুলতে পারে না

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

অযোধ্যায় গত ৫ আগস্ট রামমন্দিরের ভত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর জনসাধারণের উদ্দেশ্য এক সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণের মধ্যে দিয়ে মনে করিয়ে দিলেন, 'ভয় বিনু হোই ন প্রীতি'— এটাই শ্রীরামের নীতি। রামচরিত মানসে তুলসীদাস লিখেছেন, রামচন্দ্র চেয়েছিলেন লঙ্কায় যাওয়ার জন্য সাগর নিজেই তাদের রাস্তা করে দিক। কিন্তু তিন দিন কেটে গেলেও সমুদ্র গা করেনি। তখন বিরক্ত হয়ে শ্রীরাম বলেন, ভয় ছাড়া প্রীতি হয় না। সমুদ্রকে শুকিয়ে দেওয়ার জন্য রাম ধনুর্বাণ তোলার পরেই সমুদ্র হাতজোড় করে হাজির হয় তাঁর কাছে।

রামমন্দির আন্দোলন নিয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই ভাষণ, স্বাধীনতা দিবসের ৭৩ বছর পর হিন্দু বাঙ্গালির কাছে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে আনে। সম্প্রতি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গে যে ধ্বংসলীলা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, বোধহয় সময় এসেছে এবার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের।

ইতিহাস আমাদের অনেক কিছু শেখায়। ৪৬-এর ১৬ আগস্ট কলকাতায় প্রকাশ্য রাজপথে মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ মদতে হাজার হাজার জোহাদি মুসলমানের হাতে নিরীহ হিন্দু বাঙ্গালির হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, এরপর গান্ধীজীর অহিংসার বাণী, 'অহিংসা পরমো ধর্ম' এটি বাঙ্গালির কোনো কাজে এল না, বরং সেদিন মহাভারতের ওই উক্তির দ্বিতীয় চরণ বাঙ্গালিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল— 'ধর্মহিংসা তদৈব চ'। অহিংসাই পরম ধর্ম। তবে, ধর্মরক্ষার স্বার্থে হিংসা করা তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। পরের দিন গোপাল মুখোপাধ্যায়, যুগল ঘোষ ভানু বোস, বিজয় সিংহ নাহার থেকে শুরু করে তৎকালীন কলকাতার সমস্ত ব্যয়মাগার আখড়া থেকে দলে দলে হিন্দু যুবক সেদিন হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়েই প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

গান্ধীবাদী অহিংসা সেদিন কোনো কাজেই এল না। পাঁচজন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী বাঙ্গালির শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে খুন হন— ভূদেব সেন, স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্র মিত্র, সুশীল দাশগুপ্ত, লালমোহন সেন। লালমোহন ছাড়া এই চারজনই কলকাতায় খুন হন। লালমোহনবাবুকে হত্যা করা হয় নোয়াখালিতে। নোয়াখালির সন্দ্বীপে গণহত্যার সময়। এর বাইরেও বহু সুশীল বাঙ্গালি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সেদিন অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

অভিনেতা ছবি বিশ্বাস থেকে গণিতজ্ঞ যাদব চক্রবর্তী, রাজা দেবেন্দ্র মল্লিক থেকে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এস এন মুখার্জি কেউই সেদিন রেহাই পাননি। ক্যানিং স্ট্রিট, ওয়েলেসলি স্ট্রিট, কর্পোরেশন স্ট্রিট, ধর্মতলা স্ট্রিট, মানিকতলা রোড, বিবেকানন্দ রোডে গণলুঠ হয়। বিখ্যাত দোকান কমলালয় স্টোর্স, ভারতকলা ভাণ্ডার, লক্ষ্মী স্টোর্স লুঠ হয়। উত্তর ও মধ্য কলকাতার হিন্দুপাড়াগুলি আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হয় গড়পাড়, নারকেলডাঙা, ফুলবাগান, বেলেঘাটা, পার্ক সার্কাস, কলুটোলা, চিৎপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি হিন্দু বাঙ্গালির বাড়ি। ক্যানেল ওয়েস্ট স্ট্রিট, গ্যাস স্ট্রিট, ফিরার্স লেন, মোটিয়াবুরুজ, লিচুবাগান প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

এর পরেও কী বাঙ্গালি ঘুমিয়ে থাকতে পারে? বাঙ্গালির এই আখড়াগুলোই তো ছিল ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের ট্রেনিং সেন্টার।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন যদি পশ্চিমবঙ্গের আত্মপ্রকাশ না হতো তাহলে আজ কোটি কোটি হিন্দু বাঙ্গালি হয় ধর্ম পরিবর্তন করে ভীরু কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকতো, নয়তো সিন্ধি অথবা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতো যাযাবর হয়ে ঘুরে বেড়াত।

স্বাধীনতা আসন্ন বুঝে, মুসলিম লিগ কংগ্রেসের সঙ্গে দর কষাকষির খেলায় পুরো বাঙ্গলাকে কবজা করবার জন্য নিজেদের শক্তিকে জাহির করতে নেমে পড়েছিল। এর কদিন আগেই, ২৯ জুলাই বোম্বাইতে মুসলিম লিগের অধিবেশনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন জিন্না। বলেছিলেন, 'আমি নীতিকথার আলোচনায় যেতে চাই না। আমাদের হাতে বন্দুক আছে এবং আমরা তা ব্যবহার করতে প্রস্তুত।' তারা তা ব্যবহার করেওছিল।

বাঙ্গালি বীরের জাত। স্বাধীনতা আন্দোলন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। পাল, সেন রাজাদের বীরত্বের কথা কি ইতিহাস ভুলে গেছে? মহারাজা শশাঙ্ক?

প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়ের হাত ধরেই উঠে এসেছেন সূর্য সেন, বাঘাযতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশেরা। তাই সেদিন বীর বাঙ্গালির উত্তরাধিকারী গোপাল পাঁঠা, যুগল ঘোষ, ভানু বসুদের সমবেত প্রচেষ্টায় উন্মত্ত মুসলমানদের প্রতিহত করা ও যোগ্য জবাব দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

পরের বছর ড. শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে বাঙ্গালির জন্য একখণ্ড জমি ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগে সমবেত প্রয়াসও আমরা লক্ষ্য করেছি। নয়তো মুসলিম লিগের চাহিদামতো এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও শরৎ বসুর মতো অর্বাচীন নেতাদের ভ্রষ্ট রাজনীতির ফলে সম্পূর্ণ বঙ্গপ্রদেশই চলে যেত পাকিস্তানের গর্ভে।

পশ্চিমবঙ্গ কেবলমাত্র একটি প্রদেশ নয়, বরং বলা চলে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার। এ রাজ্যের অস্তিত্ব সংকট হলে, ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারকেই খর্ব করবে। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন যদি পশ্চিমবঙ্গের আত্মপ্রকাশ না হতো তাহলে আজ কোটি কোটি হিন্দু বাঙ্গালি হয় ধর্ম পরিবর্তন করে ভীরু কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকতো, নয়তো সিন্ধি অথবা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতো যাযাবর হয়ে ঘুরে বেড়াত।

বাঙ্গালির দুর্ভাগ্য— শ্যামাপ্রসাদ, হরিপদ ভারতীর পর অন্তত তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব বাঙ্গালি সমাজে রয়েছে। ডাঃ বিধান রায়ের পর তেমন বাঙ্গালি প্রশাসক চোখে পড়েনি। কিন্তু বসিরহাট, দেগঙ্গা, ধুলাগড় আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে হিন্দু বাঙ্গালি প্রতিহত করা ভুলে যায়নি।

কলকাতকে না পাবার বেদনা পাকিস্তান আজও ভুলতে পারেনি। সেদিন যদি শ্যামাপ্রসাদ না আসতেন, তাহলে পুরো বঙ্গপ্রদেশ-সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল পাকিস্তানে চলে যেত। অরুণাচল চলে যেত চীনের দখলে। পূর্ব পাকিস্তান কখনই বাংলাদেশ হতো না। রাওয়ালপিণ্ডি বা করাচী নয়, পাকিস্তানের মূল কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতো পূর্ব দিকে।

সত্তর বছর ধরে এই বেদনা বুকে নিয়ে আরব সাম্রাজ্যবাদীরা ঘুঁটি সাজাচ্ছে। চোরাগোপ্তা মেরে বারবার অশান্ত করার চেষ্টায় তারা প্রতি মুহূর্তে সজাগ। সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির জনবিন্যাস যেমন বদল করিয়ে দিয়েছে, তেমনি দীর্ঘ বছর ধরে সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের উৎকোচের প্রলোভন দেখিয়ে এদের সমস্ত অপচেষ্টা, দুর্বৃত্তি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ছেচল্লিশের ভয়াবহ দাঙ্গার পর দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে ভিটে মাটি হারিয়ে, চরম অত্যাচারিত হয়ে যেভাবে কয়েক কোটি হিন্দু বাঙ্গালি ওপার থেকে এপারে এসে স্থিতু হয়েছে, এই অবস্থানের বদল তারা সহজে মেনে নেবে না।

ছেচল্লিশে কলকাতার গণহত্যা সংঘটিত করবার জন্য সেদিন প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদত জুটেছিল। লালবাজারে কন্ট্রোল রুম খুলে পুলিশ প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রেখে কয়েক হাজার নিরীহ হিন্দু বাঙ্গালিকে হত্যা করেছিল। তারই পুনরাবৃত্তি আমরা আবার দেখলাম নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আন্দোনলের নামে। চতুর্দিকে অগ্নিসংযোগ, রেললাইন উপড়ে, রেলের ইলেকট্রনিক সিগন্যাল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে উত্তর দক্ষিণের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আটকে দিয়ে সেদিনের মতো আবার তাদের হুংকার শোনা গেল— 'অসুবিধা করার একশো উপায় আমাদের জানা আছে'। এবারও প্রশাসন চুপ। মিডিয়া চুপ। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মোমবাতি মিছিল কেন, কোনো অসন্তোষসূচক বাক্যও চোখে পড়েনি।

তবে, আরব সাম্রাজ্যবাদীরা যতই মদত জোগাক, সমাজ কিন্তু দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। সংবাদমাধ্যম উদাসীন হয়ে থাকলেও সোশ্যাল মিডিয়া এই বর্বরতার ছবি গোটা দুনিয়ায় রাষ্ট্র করেছে। কমিউনিস্টদের আর কোনো প্রভাব নেই। সুবিধাবাদী উৎকোচভোগী বুদ্ধিজীবীদের মুকোশ খুলে গেছে। জনতা জেগে উঠেছে।

ষাট সত্তরের দশকের একটি কবিতার লাইন এখন হিন্দু বাঙ্গালির মুখে মুখে ফিরছে— ''জমি কারো বাপের নয়, জমি হইল গিয়া দাপের''। প্রেম প্রীতি উদারতা ভ্রাতৃত্ব অনেক হয়েছে। ভবি ভুলবার নয়। তাই, অন্যায় অত্যাচারের ভয়ে মুখ লুকিয়ে বসে না থেকে রুখে দাঁড়াবার ১৬ আগস্টের শিক্ষাই বাঙ্গালিকে বারবার মনে করিয়ে দেবে।

তুলসীদাস তো যথার্থই লিখেছেন—

বিনয়া ন মানতো জলধি জর গয়ে তিনি দীন বীতি
বোলে রাম সকোব তব ভয়া বিনু হোই না প্রীতি।।
লছিমানা বান সরায়েন আনু সৌযোবরিধি বিসিখা কৃষাণু।
শঠ সানা বিনয় কুটিল সানা প্রীতি, সহজে কৃপানা সানা সুন্দর নীতি। ■

With Best Compliments From -

A Well Wisher

সেদিন বাঙ্গালি হিন্দু লড়েছিল এক হয়ে

বিজয় সিংহ

উনিশশো ছেচল্লিশ সালের ১৮ আগস্ট। ভোরের আলো ফুটেছে কী ফোটেনি। ঘড়িতে সাড়ে চারটে। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন উত্তর কলকাতার এক দুগ্ধ ব্যবসায়ী। কিন্তু সেদিনের সূর্য তাঁর কাছে অদেখাই থেকে গিয়েছিল। পশ্চিম দিক থেকে আসা মরুঝড় শাণিত ছুরির রূপ ধরে নেমে এসেছিল তাঁর উপর। নামটা জানা যায়নি আজও। কিন্তু তিনিই কুখ্যাত 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর প্রথম শিকার। তারপর চার দিন ধরে রক্তগঙ্গা বয়েছিল কালীক্ষেত্র কলকাতায়। প্রথম দিকে উজানে, তারপর পালটা ভাটার টানে।

কলকাতা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা ছাপতে আরম্ভ করে এবং ওই পত্রিকারই সম্পাদকীয়তে এই ঘটনাকে 'The Great Calcutta Killing' নামে অভিহিত করা হয়। কলকাতা তখন ছিল বঙ্গপ্রদেশের রাজধানী এবং তার শাসনকর্তা ছিল মুসলিম লিগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হাসান শাহিদ সোহরাওয়ার্দি। কংগ্রেস নেতৃত্ব মুখে বলত অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার কথা। গান্ধীজী বলেছিলেন ভারত ভাগ করতে গেলে তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়েই করতে হবে। কিন্তু কলকাতা গণহত্যার পর আক্ষরিক অর্থেই ভীত হয়ে পড়ে কংগ্রেস। গান্ধীজী ছিলেন নীরব, তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কোনো বিবৃতি দেননি। জওহরলাল নেহরু কেন্দ্রে ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে মুসলিম লিগের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। গান্ধী বা নেহরু কেউই কলকাতা গণহত্যার পর নাগরিকদের অবস্থা দেখতে কলকাতা আসেননি।

সলতে পাকানো চলছিল বহুদিন ধরে। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছিল। মুসলিম লিগ পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিতে ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কংগ্রেস এই দাবিকে আপাতভাবে প্রত্যাখ্যান করলে, প্রাক্তন কংগ্রেসি জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ বাহুবলে পাকিস্তান ছিনিয়ে নেবার হুমকি দেয়। 'লড় কে লেঙ্গে পাকিস্তান' নামক কুখ্যাত স্লোগানটি এই সময় পাকপন্থীদের মধ্যে ভারত জুড়ে ধ্বনিত হতে থাকে।

১৯৪০ সালে ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাবে জিন্না বললেন, ''ভারতবর্ষের সমস্যা সাম্প্রদায়িক নয়, বরং জাতিগত। এটা খুবই দুঃখের যে হিন্দুরা ইসলাম ও হিন্দুত্বের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারছেন না। ইসলাম ও হিন্দুত্ব শুধুমাত্র আলাদা ধর্ম নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত দুই জাতিসত্তা। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, হিন্দু ও মুসলমানরা দুটি পৃথিক ইতিহাস থেকে প্রেরণা পায়। এদের একজনের মহাপুরুষ অন্য জনের শত্রু। মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয়, মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি। জাতি গঠনের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান তাদের মধ্যে আছে। তাই তাদের অবশ্যই নিজের বাসভূমির অধিকার আছে।''

২৮ জুলাই বোম্বেতে মুসলিম লিগ পাকিস্তানের দাবিতে ঘোষণা করে যে, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' অনুষ্ঠিত হবে সারা ভারত জুড়ে। বঙ্গপ্রদেশ ছিল মুসলমান শাসনাধীনে থাকা ভারতের একমাত্র প্রদেশ। লিগ নেতৃত্বও এখানেই পাকিস্তানের দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বাস্তব রূপ দেখানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৬ সালের ৫ আগস্ট স্টেটসম্যান পত্রিকার এক নিবন্ধে সোহরাওয়ার্দি লিখলেন, ''হিংসা ও রক্তপাত অন্যায় নয় যদি তা মহৎ উদ্দেশ্যে করা হয়। মুসলমানদের কাছে আজ পাকিস্তান আদায় করা ছাড়া অন্য কোনো প্রিয় কাজ নেই।''

ওই দিনই খাজা নাজিমুদ্দিন, তিনি পরে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি মুসলিম ইনস্টিটিউটে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডদের এক সমাবেশে বলেন, ''মুসলিম লিগের এটা পরম সৌভাগ্য যে, এই রমজান মাসেই সংগ্রাম শুরু হবে। কারণ এই রমজান মাসেই জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লা।'' এই সঙ্গেই কলকাতার মেয়র ওসমান খান উর্দুতে একটি প্রচারপত্র বিলি করেন যাতে লেখা ছিল, ''আশা ছেড়ো না, তরোয়াল তুলে নাও। ওহে কাফের, তোমাদের ধ্বংসের দিন বেশি দূরে নয়।'' এই লিফলেটে ছিল তরোয়াল হাতে জিন্নার ছবি। এছাড়া মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে হিন্দুদের কীভাবে হত্যা করা হবে সেই রকম ২৩টি নির্দেশ সংক্রান্ত একটি লিফলেট বিলি করা হয়।

ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছাত্র-শ্রমিক-সহ সর্বস্তরের পাকিস্তানপন্থী মুসলমান সেদিন জিন্না-সোহরাওয়ার্দির ডাকে সাড়া দিয়েছিল। বাঙ্গালিদের মধ্যে একটা চাপা আতঙ্ক। ঠিক কী হতে চলেছে তাই নিয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিল না তাদের মধ্যে।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ভোর চারটায় মানিকতলায় যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল তা সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজাবাজার থেকে মানিকতলা, শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা, রিপন কলেজ থেকে চৌরঙ্গী, রক্ত আর রক্ত। একের পর এক সশস্ত্র মিছিল, লুঠতরাজ,

জনসমাবেশ, ছুরি, গুলি, ধর্ষণ, হিন্দুর রক্ত। প্রথম দিনটা একতরফা মার খেল হিন্দুরা।

তখন কলকাতা শহরে ছিল অন্তত দুটি ডিপার্টমেন্ট স্টোর্স, যারা শপিংমলের আদি পুরুষ। একটি 'হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন', অপরটি 'কমলালয় স্টোর্স'। ধর্মতলা রোডের কমলালয় স্টোর্স ছিল কলকাতার অন্যতম নক্ষত্র। এখানেই ১৯৪৩ সালে বইয়ের দোকান খোলেন রাম হালদার। বিদেশ থেকে সদ্য প্রকাশিত বইও পাওয়া যেত। আর পাশেই ছিল চায়ের দোকান। এই ঘটনা তখন কলকাতার কবি সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ শিল্পীদের কাছে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। লেগেই থাকত তারকা সমাবেশ। গোপাল হালদার, সুশোভন সরকার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলি, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর... কাকে ছেড়ে কার কথা বলবেন।

কমলালয় স্টোর্স লুঠ হয়ে গেল। রক্ষা পেল না চলচ্চিত্রকার ছবি বিশ্বাসের বাড়ি, গণিতজ্ঞ যাদব চক্রবর্তীর বাড়ি। হিন্দু বাঙ্গালি জেগে উঠল তারপর। বুঝতে পারল যে হিন্দুদের বাঁচাতে সরকার বা পুলিশ কিছুই করবে না। অতএব যা করার নিজেদেরই করতে হবে। এই ভাবনা প্রবল ভাবে যাঁদের মনে জেগে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম গোপাল মুখার্জি, যুগল ঘোষ। গোপাল মুখার্জি বেশি পরিচিত ছিলেন গোপাল পাঁঠা নামে। তিনি নিজে ছিলেন একজন মাংসবিক্রেতা। পাঁঠার মাংস বিক্রি করতেন বলে যাঁর নাম হয়েছিল গোপাল পাঁঠা। সেই গোপাল পাঁঠা, যুগল ঘোষেরা একদিনের মধ্যে হাজারখানেক হিন্দু ও শিখ যুবককে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলেন এক বাহিনী এবং পালটা প্রতিরোধ করতে শুরু করেন। কিন্তু তাদের কয়েকটি কড়া নির্দেশ ছিল। প্রথমত নিরস্ত্র মুসলমানকে মারবে না। নিরপত্তা চাইলে তাকে বা তার পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, মুসলমান মেয়েদের দিকে মুখ তুলে তাকাবে না। কিন্তু অস্ত্রধারী মুসলমানকে ছাড়া চলবে না। হরেন ঘোষ নামে এক গানের শিক্ষক ছিলেন যিনি সোহরাওয়ার্দির বাহিনীর অনেক ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছিলেন। সোহরাওয়ার্দির মেয়েকে তিনি গান শেখাতেন। একদিন ছোট্ট মেয়েটির হাত থেকে একটি কাগজ উদ্ধার করেন। তাতে লেখা ছিল হাওড়া ব্রিজ, টালার জলট্যাঙ্ক, ভিক্টোরিয়া, শিয়ালদহ স্টেশন কীভাবে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে তার প্ল্যান। হিন্দু বাহিনী প্রতিটি জায়গা থেকে হামলাকারীদের হটিয়ে দিল। পুলিশ বেগতিক দেখে সেই জায়গাগুলোর দখল নিল। সোহরাওয়ার্দির সন্দেহ গিয়ে পড়ল নিজের মেয়ের শিক্ষক হরেন ঘোষের উপর। পরে ছয় টুকরো অবস্থায় পাওয়া যায় হরেন ঘোষের দেহ।

গোপালচন্দ্র মুখার্জি

গোপাল মুখার্জি, যুগল ঘোষ, হরেন ঘোষ শুধু নয়, শিখদের সঙ্গে হাতে হাত রেখে সর্বস্তরের বাঙ্গালি হিন্দু জেহাদিদের সবক শেখাতে রাস্তায় নেমেছিল সেদিন। সোহরাওয়ার্দি ভাবতেও পারেনি সেই প্রতিক্রিয়ার কথা। কালীক্ষেত্র কলকাতাকে পাকিস্তানের দখলে পাওয়ার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

খুব দ্রুত পরিস্থিতি দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে যেতে থাকে এবং সোহরাওয়ার্দি তাঁর বিপদ বুঝতে পারেন। তাই মার খেতে শুরু করতেই সোহরাওয়ার্দি দ্রুত পুলিশ প্রশাসনকে সক্রিয় করেন এবং দাঙ্গা থামাতে বাধ্য হন।

পূর্ববঙ্গের রংপুর কারমাইকেল কলেজের ২০ বছর বয়সী এক প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রের বিবরণ— ''পাড়া হলো বিমর্ষ। গভীরভাবে চিন্তিত। বিকেলের দিকে পাড়ার বয়োবৃদ্ধরা সমাগত হলেন এবং আমাদের পাড়ায় যদি মুসলমান গুন্ডাদের কোনো আক্রমণ হয় তার প্রতিরোধের বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। এক পুরানো জীর্ণ গোয়ালঘর ভেঙে ফেলে তার ধ্বংসাবশেষ থেকে ইঁট-পাটকেল সংগ্রহ করে সুরক্ষার দৃষ্টিতে পাড়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে জমা করা হলো যাতে আক্রমণকারীদের তার দ্বারা প্রতিরোধ করা যায়। স্বেচ্ছাসেবকেরা পাড়ার বিভিন্ন প্রান্তে মোতায়েন হলেন যাতে কী ঘটছে বা না ঘটছে তার খবর সত্বর জানা যায়।

সন্ধ্যা এল। চারিদিক শ্মশানের স্তব্ধতা। পাড়ার তরুণদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কোনো স্লোগান না দিতে বা প্ররোচনামূলক কোনো কর্ম থেকে বিরত থাকতে, কারণ আমাদের পাড়ার পিছনে ছিল মুসলমান বস্তি। সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ আমাদের পাড়া ঘিরে ফেলে মশালধারী মুসলমান গুন্ডারা। আমরা সবাই উত্তেজনায় অস্থির, হাতে হাতে ইঁটপাটকেল তুলে নিলাম, শ্বাস-প্রশ্বাস চেপে অপেক্ষা করতে লাগলাম প্রতিআক্রমণের। কিন্তু আমরা কোনো স্লোগান দিলাম না। মশালধারী গুন্ডারা কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল, তারপর চলে গেল। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমাদের ত্রিতল বাড়ির

চিলেকোঠা ছিল আমাদের পাড়ার নজরদারির স্থল। এখান থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা নজর রাখছিল রাতের আকাশের দিকে। এই অধমও ছিল সেই দলে। আমাদের পাড়া ছিল নগরীর পূর্বপ্রান্তে । হুগলি নদী ছিল পশ্চিম প্রান্তে। নগরীর জনবহুল অঞ্চল ছিল পূর্বে আপার সার্কুলার রোড এবং পশ্চিমে হুগলি নদীর মাঝামাঝি অঞ্চলে। রাতেও যে দিনের মতোই অরাজকতা একভাবে সমানে চলেছে তার প্রমাণ রাত্রির আকাশে ছিল সর্বব্যাপী। নগরীর প্রাণকেন্দ্রগুলি আলোকিত হয়ে উঠেছিল দিগন্তবিস্তৃত অগ্নিশিখার ফলে। মনে হয় মুসলমান অগ্নিপ্রদানকারীদের প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। বসবাসের বাড়িঘর এবং কলকারখানায় তীব্রভাবে চলছিল অগ্নিপ্রদান। ঠিক কোন কোন অঞ্চলে অগ্নিদাতারা ছিল সক্রিয় তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা আমাদের পক্ষে অবশ্য সম্ভবপর হয়নি।

মুসলমানদের উৎসবের রমজান মাস চলছিল এবং তাঁরা রোজা রাখছিলেন। পরের দিন ১৭ আগস্ট, সকালবেলা ছিল শান্ত। প্রধান রাস্তাটি যদিও ছিল জনহীন। যানচলাচলও শুরু হয়নি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করছিলাম যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বাস্তবিক ফিরে দেখলে বুঝি, এই দ্বিতীয় দিনটি ছিল প্রথম দিনের (১৬ আগস্ট) চেয়েও বেশি ঘটনাবহুল। দুপুর ১২টার সময় এক তরুণ প্রতিবেশী ছুটে এসে আমাকে খবর দিল যে এক মুসলমান গুন্ডারা বর্শা নিয়ে আমাদের পাড়ার ভগ্নপ্রায় দরজায় অপেক্ষা করছে। আমি দরজার সামনে গিয়ে দেখলাম বর্শার ফলাটি রোদে ঝিকমিক করছে। বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে ষণ্ডামার্কা পেশোয়ারি গুন্ডারা চেষ্টা করছে পাড়ায় ঢুকতে। মুসলিম লিগ নেতা সোহরাওয়ার্দি সারা ভারতে থেকে মুসলমান গুন্ডাদের কলকাতায় আনিয়ে রেখেছিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের আগেই। আমার প্রতিবেশী ও আমি হাতে ইঁট নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের কাছে এ ছিল এক কঠিন মুহূর্ত। গুন্ডারা কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে শেষে রণে ভঙ্গ দিল।

এক ঘণ্টা বাদে আমরা দূর থেকে স্লোগান শুনতে পেলাম। ১৬ আগস্টের পরে প্রথমবার কানে এল 'জয় হিন্দ' ও 'বন্দে মাতরম্'। বোঝা গেল, অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। এতক্ষণ যা ছিল একতরফা মুসলমান আক্রমণ, এবার সেখানে জন্ম নিয়েছে হিন্দু প্রতিরোধ। মনে হলো লড়াই মির্জাপুর স্ট্রিট ও হ্যারিসন স্ট্রিটের (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) সংযোগস্থলে পূরবী সিনেমা হলের সামনে হচ্ছে। পরে জানতে পেরেছিলাম মুসলমান গুন্ডারা এক হিন্দু আবাসিক হোস্টেলে হামলা করে। কিন্তু হিন্দু বাসিন্দারা প্রত্যাঘাত করে এবং তাদের দূরে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যে স্লোগান আমরা শুনতে পেয়েছিলাম তা প্রতিরোধকারী হিন্দুদের আওয়াজ। বেলা পড়তে আপার সার্কুলার রোডে আবির্ভাব হলো একটি ট্রাকে করে একদল শিখের, পাগড়ি বিহীন কিন্তু হাতে তাদের খোলা তরবারি। মুসলমানরা আতঙ্কিত হলো এবার। রাজাবাজারের মুসলমান গুন্ডাদের দেখাসাক্ষাৎ মিলল না। বরং পাশের মুসলমান পাড়ার বাসিন্দারা হাতে ইঁট পাটকেল নিয়ে নিজের নিজের সদর দরজায় আত্মরক্ষায় তৈরি হলো। এই শিখরা এসেছিল দক্ষিণ কলকাতা থেকে। হিন্দুদের দুর্ভাগ্যপূর্ণ অবস্থা খতিয়ে দেখতে, হিন্দুদের অবস্থা নিয়ে বহুবিচিত্র রটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে। তারা মুসলমান অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এই জন্যই উদ্দেশ্যপূর্ণমূলকভাবেই গিয়েছিলেন। শিখদের নিয়ে ট্রাকটি রাজাবাজারের সায়েন্স কলেজ অবধি গিয়ে আবার ফিরে গেল। যে মুহূর্তে ট্রাক ফিরে গেল, মুসলমান গুন্ডার দল বেরিয়ে এল এবং চলে যাওয়া ট্রাকটির দিকে বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল। আমাদের এক প্রৌঢ় প্রতিবেশী এক পুলিশ অফিসার, তাঁর রিভলভার যুক্ত বেল্ট সমেত ইউনিফর্ম পরে সাহসের সঙ্গে সমনের বড়ো রাস্তায় এগিয়ে গেলেন এবং সুসংবাদ আনলেন যে মিলিটারি ট্রাক প্রহরা দিতে আপার সার্কুলার রোডে শীঘ্রই বেরুবে যাতে বড়ো রাস্তায় কোনো সমস্যা না থাকে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা এল। আমরা লাউড স্পিকারে শুনলাম মুসলমান নেতাদের ঘোষণা। তাঁরা আমাদের অঞ্চলের মুসলমানদের রাস্তায় না বেরুতে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন, কারণ সৈন্যদের দেখামাত্র গুলি চালানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা আমরা অবাক হয়ে গেলাম যখন জনতার স্লোগান শুনতে পেলাম। আমরা আশঙ্কা করলাম যে আমাদের পিছনের মুসলমান অঞ্চল থেকে আক্রমণ আসন্ন। কিন্তু কিছুক্ষণ দেখার পর আমরা বুঝলাম যে মুসলমানরা গুলি খাবার ভয়ে লুঠপাটের উদ্দেশ্যে আর বেরোয়নি, বরং তাদের নিজ নিজ ছাদ থেকে স্লোগান দিচ্ছে। স্লোগানগুলি ছিল 'আল্লাহ হো আকবর', 'কায়েদ-এ-আজম জিন্দাবাদ', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান', 'নারা-এ-তকবীর' ইত্যাদি। আমরা ধীরে ধীরে নিরন্তর স্লোগানের আওয়াজকে স্বাভাবিক ধরে নিলাম এবং তাকে গুরুত্ব দেওয়া বন্ধ করলাম। ইতিমধ্যে মিলিটারী ট্রাকগুলি সামনের বড়ো রাস্তায় টহল দেওয়া শুরু করেছে। ট্রাকের চালক আমাদের ইঙ্গিতে আমাদের পাড়ার সামনে দাঁড়ালেন। ট্রাকের প্রধান কর্তা ছিলেন এক ব্রিটিশ সৈন্য, আমাদের অনুরোধে তিনি আমাদের কানা গলিতে ঢুকলেন এবং আমাদের বাড়ির চিলেকোঠায় এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তিনজন গাড়োয়ালি সৈন্য। আমরা পিছনের মুসলমান বস্তিটি দেখালাম যেখান থেকে আমরা আক্রমণের আশঙ্কা করছিলাম। গাড়োয়ালি সৈন্যরা তাদের বন্দুক উঁচিয়ে মুসলমান বসতির দিকে তাক করল। আমরা তাদের ভাবভঙ্গি দেখে আশ্বস্ত হলাম এবং ট্রাকের কর্তাকে আমাদের সুরক্ষার জন্য পাড়ায় সারারাত্রি ধরে সৈন্য মোতায়েন করার প্রহরার অনুরোধ জানালাম। তিনি

আমাদের অনুরোধ মানতে তাঁর অপারগতা জানালেন কিন্তু আশ্বাস দিলেন যে, রাত্রিতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ট্রাকটি আমাদের পাড়ার সামনে দাঁড়াবে এবং তিনি নিজে আমাদের অবস্থা সরেজমিনে দেখে যাবেন। এই ১৭ আগস্টের রাত্রি এরপর মসৃণভাবে পেরিয়ে গেল কোনো ঘটনা ছাড়াই।

পরের দিন ১৮ আগস্ট। তৃতীয় দিন সকাল নিয়ে এল এক সুবার্তা। রিলিফের গাড়ি দক্ষিণ কলকাতা থেকে দাঙ্গাপীড়িত উত্তর-পূর্ব এবং মধ্য কলকাতায় এল গত দুদিন যাবৎ বিচ্ছিন্ন অবরুদ্ধ হিন্দু বাসিন্দাদের সুরক্ষিত জায়গা নিয়ে যাবার জন্য। আপার সার্কুলার রোডে আমাদের পাড়ার কানাগলির সামনে দাঁড়াল দুটি বাস। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, মহিলা ও শিশুদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের পালা তার পর আসবে। বাস দুটি দ্রুত বোঝাই হয়ে গেল এবং দক্ষিণ কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিল। আমি আমাদের দুর্ভাগা পাড়ার বাকি পুরুষদের সঙ্গে রয়ে গেলাম। দিনভর মিলিটারি ট্রাক প্রহরা দিল সামনের রাস্তায়। আমরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এবং কোনো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ছাড়াই অতিবাহিত হলো তৃতীয় দিনটি। আমরা তবু প্রতি মুহূর্তে নজর রাখছিলাম আমাদের পাড়ার পিছনে মুসলমান বসতির দিকে।

চতুর্থ দিন ১৯ আগস্ট সকালে আমরা আমাদের বাড়িঘর ছেড়ে রিলিফ বাসের অপেক্ষায় বসে রইলাম। বাস এল এবং আমরা সবাই জড়ো হলাম এক জায়গায়। নিশ্চিন্ত হলাম যে কেউ পড়ে নেই এই পরিত্যক্ত পাড়ায়। গত তিনদিন আমরা ছিলাম প্রকৃতপক্ষে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। বাসগুলি রওনা দিল রাজাবাজারের দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। দেখতে পেলাম করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্যাবলী। ঠেলাগাড়িতে করে মৃতদেহের স্তূপ প্রত্যেক ছোটোবড়ো গলির মুখে রাখা আছে। এই চতুর্থ দিনেও কোনো কোনো জায়গায়, যেমন রাজাবাজারে পড়ে আছে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ। বুঝলাম আমাদেরও এই গণহত্যার ব্যাপকতা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। বাসে যেতে যেতে আমরা অনুভব করলাম যে আমরা কত সৌভাগ্যবান যে গত তিনদিন ধরে কলকাতায় চলা এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেয়েছি। আমাদের বাস দক্ষিণ কলকাতা যাবার পথে স্থানে স্থানে দাঁড়াল যাতে বিচ্ছিন্ন বাসিন্দাদের তুলে নিতে পারে।

আমার দাদা ছিলেন শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় কয়েকদিন পরে। তাঁর কাছে আমি চতুর্থ দিনে মেটিয়াবুরুজে (হুগলি নদীর ধারে এক মুসলমান অঞ্চল) যে গণহত্যা হয়েছে তার ব্যাপারে জানতে পারলাম। হুগলি নদীতে মেটিয়াবুরুজের ঠিক বিপরীতেই দাদার শিবপুরের কলেজ। সেখানে ওড়িশার ৫০০ শ্রমজীবী মানুষ এক বস্তিতে বাস করত। সেখানে তারা নিজেরা ঘরের মধ্যে থেকে গিয়ে বাইরে থেকে তালা-চাবি দিয়ে চাবিটা সদর দরজার বাইরে ফেলে দিয়েছিল যাতে বাইরের সবাই ভাবে যে বস্তি ফাঁকা। মুসলমানেরা কিন্তু তাদের উপস্থিতি ধরে ফেলে এবং তাদের সবাইকে হত্যা করে মৃতদেহগুলি হুগলি নদীতে ফেলে দেয়। আমার দাদা ও তাঁর সহ-ছাত্ররা দেখেছিল ওইসব ফুলে যাওয়া নদীতে ভাসা মৃতদেহগুলি। এই গণহত্যাটি হয়েছিল চতুর্থ দিনেই।

কলকাতা নগরী আস্তে আস্তে ২০ আগস্ট থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে লাগল। নগরী এই চারদিন ছিল পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ট্রেন চলেনি, খবরের কাগজ বেরোয়নি, পৌরসেবা ছিল বন্ধ। চারদিন পরে আবার প্রকাশিত হলো দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা। তার সম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল 'The Great Calcutta Killing'।"

১৯২৭ সালের কথা। গ্রীষ্মের এক রাতে সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি নামলেন পেশোয়ার স্টেশনে। গন্তব্য কাবুল। যাত্রাপথে পেশোয়ার শহরের সিআইডি অফিসার আহমেদ আলির গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করেন। খাইবার পাখতুন প্রদেশের পেশোয়ার তখন ইংরেজদের কড়া নজরে, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যাতে ওখানে ঘাঁটি না বানায়। পেশোয়ার স্টেশন থেকে আলি

সাহেব বের হলেন, তখন তাঁর বাঙ্গালি চেহারা ইংরেজদের নজর এড়ায়নি। তারা স্থানীয় গোয়েন্দা সেই আহমেদ আলিকেই দায়িত্ব দিল লোকটার উপর নজর রাখতে। আহমেদ আলি সহাস্যে সেই কথা জানালেন মুজতবা আলিকে। তার সঙ্গে বললেন, ইংরেজ ভাবে, বাঙ্গালি মাত্রেই বোমা মারে।

এত কথার অবতারণা একটিই কারণে, হিন্দু বাঙ্গালি বীরের জাত। মার খেলে পালটা দিয়ে এসেছে চিরকাল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে তাই বাঙ্গালির সংখ্যা নজরকাড়া। 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' শুরু হতেই ঘর গোছানোর সামান্য সময় নেওয়ার পর তাই বাঙ্গালি হিন্দুরা পালটা দিয়েছিল পাকিস্তানের দাবিদারদের। গোপাল মুখার্জি, যুগল ঘোষ, হরেন ঘোষ শুধু নয়, শিখদের সঙ্গে হাতে হাত রেখে সর্বস্তরের বাঙ্গালি হিন্দু জেহাদিদের সবক শেখাতে রাস্তায় নেমেছিল সেদিন। সোহরাওয়ার্দি ভাবতেও পারেনি সেই প্রতিক্রিয়ার কথা। কালীক্ষেত্র কলকাতাকে পাকিস্তানের দখলে পাওয়ার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ■

ছেচল্লিশের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাঙ্গালি উলটে দিয়েছিল মুসলিম লিগের সব হিসেব-নিকেশ

স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী

স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিযুগ সবে শেষ হয়েছে। তখনো বাঙ্গালি এত বিলাসী ছিল না। আজকের এই অকর্মণ্যতা, মানসিক দুর্বলতা আর নিস্তেজ স্বভাবও ছিল না। লড়াইটা ছিল বীর ধর্ম। কারণ জাতিটা বিশ্বাস করত, যুদ্ধ এড়িয়ে গিয়ে শান্তি আসে না। শান্তি আনতে গেলে যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় পেতে হয়। প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে হয়। তাহলেই দু'পক্ষের শান্তি আসে। পরাজিতের জন্য শ্মশানের শান্তি এবং জয়ীর জন্য শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ। বাঙ্গালি তখন রক্ত দেখে ভয় পেত না। ক্ষণে ক্ষণে 'এত রক্ত কেন' বলে চমকে উঠত না। সুশীলতা তখনো আমাদের মনের ভিতর এইভাবে গেড়ে বসেনি। প্রয়োজনে নির্মম হতে লজ্জা পেত না বাঙ্গালি। কারণ, নৃশংসতাকে হারাতে গেলে আরও বেশি নৃশংস হতে হয়। এই দৃঢ় চরিত্রের জন্যই সেদিন কলকাতা শহরটাকে ভারতের মধ্যে ধরে রাখা গেছিল।

১৯৪৬ সালটা ছিল বাঙ্গালির ভাগ্য নির্ধারণের বছর। ১৯০৫-এ যে বঙ্গভঙ্গ আটকে গিয়েছিল বাঙ্গালির অসীম চেষ্টায়; দেশভাগের ঠিক আগের বছর, কলকাতা-সহ বঙ্গপ্রদেশের পুরোটা দখল করতে মরিয়া হয়ে ওঠে মুসলিম লিগ। আগস্ট মাসে কলকাতার হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা এবং অক্টোবরে নোয়াখালিতে হিন্দু গণহত্যা— এই দুটোই ছিল এক ধরনের শক্তি পরীক্ষা। দুটোয় জিতলে পুরো বাঙ্গলা আর একটায় জিতলে অর্ধেক বাঙ্গলা। যুদ্ধজয়ের এটাই হতো পুরস্কার। নোয়াখালিতে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও কলকাতার লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছিল বাঙ্গালি সমাজ। তবে জেতাটা সহজ ছিল না। লিগ নেতারা যখন কলকাতার ময়দান থেকেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়, তখনও বাঙ্গালির চৈতন্য হয়নি। তাঁরা ভেবেছিলেন, এটাও বুঝি এক ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন। কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘ পরিচয় থাকার সুবাদেই হয়তো এরকম ধারণা তৈরি হয়। তাই আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচবার কোনো ব্যবস্থাই তাঁরা করেননি। কিন্তু কংগ্রেস আর মুসলিম লিগ যে একেবারেই সমগোত্রীয় নয়, সেটা প্রথম টের পাওয়া গেল ১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এ।

বাঙ্গালি এবং অন্যান্য হিন্দুদের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কখনো কোনো অবস্থাতেই হিন্দুরা প্রথমে আক্রমণ করে না। আগে আক্রান্ত হয়, বিরাট ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে, তবেই পালটা আক্রমণে যায়। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। শুরুর তিনদিন কলকাতার রাস্তায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে জেহাদি গুন্ডার দল। বাঙ্গলার শাসন ক্ষমতায় তখন মুসলিম লিগের সরকার। পুলিশ-প্রশাসন সবই তাদের হাতে। তাই জেহাদি প্রশাসন যোগসাজেশে অবাধে চলতে লাগল হিন্দু গণহত্যা। কেশোরাম কটন মিলসের ৩০০ ওড়িয়া শ্রমিকের গলা হালাল পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে। বিহারি গয়লাদের ধরে ধরে কচুকাটা করা হয়েছে। হিন্দু মেয়েদেহ মৃতদেহ উলঙ্গ করে ঝোলানো হয়েছিল মাংস রাখার হুকের উপর। রাস্তায় রাস্তায় চলছিল উন্মত্ত জিহাদিদের হিংস্র উল্লাস।

প্রথম কদিনে প্রায় ১৫,০০০ হিন্দু নিহত ও নিখোঁজ হন। আহত, ধর্ষিত, লুণ্ঠিত আরও বহু। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে কলকাতাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন ব্যায়ামবীর গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর ব্যায়াম সমিতিতে প্রায় ৮০০ যুবক ছিল। এসব যুবকদের নিয়েই তিনি গঠন করেন হিন্দু প্রতিরোধ বাহিনী। হিন্দু যুবকদের প্রতি তাঁর আদেশ ছিল— 'ওরা একটা মারলে তোমরা দশটা মারবে।' জেহাদি তাণ্ডব থামাতে উৎসাহ দেবার জন্য যুগল ঘোষ আরও ঘোষণা করেন— 'হাফ মার্ডার করলে ৫ টাকা, ফুল মার্ডার করলে ১০ টাকা'! প্রতিরোধ শুরু হতেই কলকাতার সমস্ত বাঙ্গালি ব্যায়াম সমিতি এবং আখড়াগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শহর বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কলকাতার শিখ সমাজ, বিহারি গোয়ালারাও আত্মরক্ষার্থে গোপাল মুখার্জির দলে যোগ দেন।

তখনকার বাঙ্গালি একেবারে অস্ত্রহীন ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কলকাতায় আসা মার্কিন সেনাদের থেকে কেনা বন্দুক অনেকের সংগ্রহে ছিল। এমনকী, এসব বন্দুকের কালোবাজারি এবং অ্যাসিডের ব্যবসাও ছিল বাঙ্গালিদের দখলে। বোতলে পেট্রোল ভরে কীভাবে পেট্রোল বোমা বানাতে হয়, কীভাবে দেশি পেটো বানাতে হয়, অগ্নিযুগের এসব শিক্ষা বাঙ্গালি ভোলেনি। অ্যাসিড, পেট্রোল, মার্কিন বন্দুক ও পেটো, এসব নিয়ে শুরু হলো জেহাদিদের প্রতিরোধ। পুলিশ, প্রশাসন, সরকার সবাই যখন বিপক্ষে, গভীরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একটা জাতি উলটে দিয়েছিল মুসলিম লিগের সব হিসেব-নিকেশ। শুরুটা ওরা করেছিল ঠিকই। তবে শেষটা হিন্দুদের হাতেই হয়েছিল।

সেদিনকার বাঙ্গালির সাফল্যের রহস্য ছিল তিন 'ব'-এর সঠিক ব্যবহার। বুদ্ধি,

ব্যায়াম ও ব্যবসা। আজকের বাঙ্গালির জাতীয় দুর্বলতার পিছনেও ঠিক তিনটে 'ব' রয়েছে। বিশ্ব-মানবতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও বাবুসোনা সংস্কৃতি। বিশ্বমানবতা বাঙ্গালিকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতি, জাতি এবং ধর্মই একদম একরকম। কেউ কারো থেকে ভালো বা খারাপ নয়। বাঙ্গালি বাবা-মায়েরা খুব একটা ইতিহাস সচেতন নন। তাঁরা ভুলে গেছেন মুসলিম লিগের করা কলকাতার হিন্দু নরসংহার, নোয়াখালির হিন্দু গণহত্যা। পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের বংশধররা ভুলে গেছেন, কাদের জন্য, কী কারণে বাপ-ঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে এই পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসতে হলো। আমাদের সরকার, শিক্ষা ব্যবস্থাও আমাদের এই ইতিহাস জানানোর কোনো ব্যবস্থা করেনি। আমাদের সমাজ আমাদেরকে চিনতে দেয়নি বাঙ্গালি সংস্কৃতির সঙ্গে আরবি সংস্কৃতির পার্থক্যগুলো। আমাদের গণমাধ্যমগুলোও পেট্রোডলারের লোভে ক্রমাগত এই সংক্রান্ত মিথ্যাচার করে চলেছে। প্রতিটা বাঙ্গালি ভুল শিখছে এবং বিভ্রান্ত হয়েছে।

৩৪ বছরের বাম-শাসন বাঙ্গালিকে আরও শিখিয়েছে যে জাতীয়তাবোধ খুব খারাপ জিনিস। এমনকী অন্যায়। দেশকে নিয়ে গর্ব করার বা দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার আসলে কোনো দরকার নেই। এসবের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। যাতে দেশের কোনো বিপদে- আপদে আমরা দেশরক্ষায় রুখে না দাঁড়াই। এমন ভাবে মগজধোলাই চলতে থাকলে, আমরা নিজেরাই একদিন দেশটাকে, রাজ্যটাকে টুকরো টুকরো করে রেখে দেব। দেশ, রাজ্য এগুলো নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় একটা গুরুত্বহীন জিনিস হয়ে দাঁড়াবে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দিয়ে বাঙ্গালি হয়তো রাজ্যটাকে এমন সব সংস্কৃতির মানুষ দিয়ে ভরিয়ে তুলবে, যারা ভিতরে ভিতরে এই রাজ্যটাকে লুটতে ও ধ্বংস করতে চায়। বিশ্বমানবতা আমাদেরকে এরকমই আত্মঘাতী কাজে ব্যবহার করতে চায়।

বিশ্বমানবতা আসলে এক ধরনের সাম্রাজাবাদী ধারণা। শক্তিশালী জাতিগুলো নিজেদের সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণা দুর্বল জাতিগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেয়। এভাবে শক্তিশালী জাতির সংস্কৃতি গ্রহণ করে দুর্বল জাতিগুলো পরনির্ভর এক মানসিক দাসে পরিণত হয়। এই বিশ্বমানবতাই পরোক্ষে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে বৈধতা দিয়েছে। জাতি, দেশ, রাষ্ট্র ইত্যাদির ধারণা যখন কোনো সমাজ অন্যায্য বলে ধরে নেয়, ব্যক্তির ইচ্ছা, ব্যক্তির লাভই সেখানে একমাত্র মোক্ষ হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সামাজিক লাভ, জাতীয় স্বার্থকে নির্দ্বিধায় বলিদান দেওয়া যায়। এভাবেই বাঙ্গালি শিখেছে গা বাঁচিয়ে চলতে, দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যেতে। কারুর সাহায্যে এগিয়ে না আসতে, কারুর সমস্যায় পাশে না দাঁড়াতে। প্রতিটি বাঙ্গালি পরিবার একেকটি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা শিক্ষার কারখানা। বাঙ্গালি বাড়িতে যখন কোনো শিশুর জন্ম হয়, ছোটো থেকেই তাকে শেখানো হয় সমস্ত রকম ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকতে। অন্যায় দেখলেও প্রতিবাদ না করতে। প্রতিবাদ করলে যদি কোনো সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে হয়! অন্য সমস্ত জাতি যখন একতাবদ্ধ হচ্ছে, বাঙ্গালি তখন একে অপরের থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। বাঙ্গালি যতই একাই একশো হোক, একশো বাঙ্গালি কিন্তু কিছুতেই এক হতে পারে না। আর একলা মানুষ যত বীর, যত মহানই হোক না কেন, তার সাধ্য সীমিত। সমষ্টির কাছে একা মানুষ অসহায়। সেই কারণেই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা

প্রায় ১৫,০০০ হিন্দু নিহত ও নিখোঁজ, আহত, ধর্ষিত, লুণ্ঠিত আরও বহু। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে কলকাতাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন ব্যায়ামবীর গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর ব্যায়াম সমিতির প্রায় ৮০০ যুবককে নিয়েই তিনি গঠন করেন হিন্দু প্রতিরোধ বাহিনী। হিন্দু যুবকদের প্রতি তাঁর আদেশ ছিল— 'ওরা একটা মারলে তোমরা দশটা মারবে।' প্রতিরোধ শুরু হতেই কলকাতার সমস্ত বাঙ্গালি ব্যায়াম সমিতি এবং আখড়াগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শহর বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কলকাতার শিখ সমাজ, বিহারি গোয়ালারাও আত্মরক্ষার্থে গোপাল মুখার্জির দলে যোগ দেন।

ভুলে জাতি হিসেবে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া এত প্রয়োজন। যে কোনো বিপদে স্বজাতির পাশে দাঁড়ানো দরকার। যাতে নিজের বিপদেও অন্যদের পাশে পাওয়া যায়।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমাদের বাঙ্গালি মায়েরা সন্তান অন্তপ্রাণ। নিজের আদরের শিশুটিকে নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনার শেষ নেই। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, হাসতে-মিশতে সদাসর্বদা শিশুটির চারপাশে ঘুরে বেড়ায় এক অদৃশ্য মায়ের আঁচল। যতদিন সম্ভব শিশুটিকে সমস্ত দায়িত্ব, সমস্যা থেকে আগলে রাখা হয়। জাতির কাজ তো অনেক পরের কথা, তার নিজের সব কাজও তাকে করতে দেওয়া হয় না। যেহেতু মায়ের সঙ্গে তার সন্তানের বয়সের পার্থক্য চিরকাল একই থাকে, ফলে মায়ের কাছে তার সন্তানটি কখনোই বড়ো হয়ে উঠতে পারে না। সে চিরকাল মায়ের 'বাবুসোনা' হয়েই থেকে যায়। এভাবে সারাজীবন মায়ের ছত্রছায়ায় বড়ো হবার কারণে বাঙ্গালি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব কখনোই পূর্ণতা পায় না। ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগই দেওয়া হয়নি। সন্তানস্নেহে অন্ধ মায়েরা এটা ভুলে যান যে, সমস্যা জীবনের অন্যতম অঙ্গ। সমস্যার মোকাবিলা করতে করতেই মানুষ শক্ত-সমর্থ হয়ে ওঠে। বাঙ্গালি মায়েদের নিজের আঁচল বাড়িয়ে আদরের বাবুসোনাটিকে জীবনের সমস্ত ব্যথা-বেদনা থেকে আড়াল করার চেষ্টা সেই শিশুটির যতটা ক্ষতি করে ততটা ক্ষতি আর কিছুই করে না। দুঃখ-যন্ত্রণা এগুলো জীবনের অভিশাপ নয়, জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। এগুলোর সঙ্গে যুঝতে যুঝতেই মানুষ নিজের দুর্বলতাগুলো চিনতে পারে, কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে।

কিন্তু মায়ের যে বাবুসোনাটিকে জীবনে কোনোদিন কোনো দায়িত্ব নিতে হয়নি, সমস্ত বিপদ থেকে আড়াল করে এসেছেন তার মাতারানি, সেই ছেলে বা মেয়েটির দুর্বল ব্যক্তিত্বের দায় আসলে কার? পড়াশোনার ক্ষতি হবার অজুহাতে যার বাবা ছেলেকে কোনোদিন নিজের ব্যবসায় সাহায্য করতে ডাকেননি; সে ছেলের বৈষয়িক বুদ্ধি কোন দৈবশক্তি এসে পাকিয়ে দিয়ে যাবে? যে ছেলেটিকে কোনোদিন কোনো পাড়ার কাজে হাত লাগাতে দেওয়া হয়নি, সমস্ত সামাজিক কাজে শ্রমদান করা থেকে যাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, কীভাবে এসব ছেলেরা দলবদ্ধ হতে শিখবে? দল তৈরি হয় সমমনস্ক মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ ইচ্ছায়। যার দুনিয়া আবদ্ধ বই ও খাতায় এবং ইন্টারনেটের পাতায়, সে দল গড়ার মতো বাকি মানুষগুলো পাবে কোথায়? যাকে কোনোদিন বাবার সঙ্গে রবিবারের বাজারে যেতে হয়নি, পাছে মাছ কাটা, মুরগি কাটার 'নৃশংসতা' দেখে তার মনে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, সেই বাবুসোনারা যে চিরকাল শিশুর মতো নিষ্পাপ এবং ফুলের মতো কোমল হয়ে থাকবে, এটাই কি স্বাভাবিক নয়? সহ্যশক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হবার অন্যতম অঙ্গ। কারণ ছোটো থেকে বড়ো হওয়াটা কেবল শরীরে ঘটে না, মনের ভিতরেও ঘটে। মধ্যবিত্ত বাড়ির বাঙ্গালি বাবুসোনারা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আড়ে বহরে বাড়ে ঠিকই, মনের বৃদ্ধি কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ থাকে। জীবনের সবরকম অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখলে মানসিক বিকাশের গতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায়। সমাজ পায় একটা জড়দগব ডিগ্রিবোঝাই বাবুমশাই, যে নিজের ছাড়া অন্য কারুর কোনো কাজে আসে না।

বাঙ্গালির মনের এই বিশ্বমানবতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, শত্রুকে ভ্রাতৃজ্ঞান করার ভাবনা, সর্বধর্মসমন্বয়ের স্বপ্নালু আদর্শ, এর সবটাই মূলত বাস্তব থেকে পালাতে চাওয়ার ফল। জগৎটা আসলে যেমন, বাঙ্গালি তাকে তেমনভাবে দেখতে চায় না। বরং তার কল্পনায় জগৎটাকে সে যেরকম ভাবে, ঠিক সেভাবেই অন্যদের সেটা দেখাতে চায়। এই আবেগ সর্বস্বতাই আমাদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নেওয়া তো দূরের কথা, নিজের জীবন নিজে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। যত দ্রুতগতিতে বাঙ্গালির নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটছে, ততই দুর্বার গতিতে পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে আবার মাথা তুলছে জেহাদি অপশক্তি। আজকের এই দুঃসময়ে খুব কম বাঙ্গালি পাওয়া যাবে, যাঁরা বাস্তবটা দেখতে এবং দেখাতে ভয় পান না। ধ্বংসের খুব কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা জাতিকে, যারা আরও একবার প্রতিরোধ গড়ে তোলার সাহস জোগাতে পারেন। জাতীয় জীবনে সমস্যা আসবেই। জীবন যত কঠিন হয়, জাতি ততই নিজের সেরাটা দিতে বাধ্য হয়। কঠিন জীবনই সার্থক জীবন। ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ছেচল্লিশের বেদনা যেন স্মরণে থাকে শয়নে স্বপনে

বিনয়ভূষণ দাশ

বিগত শতাব্দীর মধ্যপাদের দুটি ঘটনা বাঙ্গালির জীবন, সংস্কৃতি ও ভূগোলকে একেবারে বদলে দিয়েছে। ঘটনাদুটির একটি হলো, ১৯৪৬-এর ১৬ থেকে ১৮ আগস্ট ঘটে যাওয়া 'কলকাতার মহাদাঙ্গা' আর অন্যটি হলো, 'নোয়াখালি গণহত্যা'। এই ঘটনাদুটির ফলশ্রুতিতে 'বঙ্গবিভাগ'। ১৮৪৭-এর দেশভাগ এই উপমহাদেশের তথা বিশ্বইতিহাসের এক যুগনির্ণায়ক ঘটনা। কিন্তু বাঙ্গালির জীবনে তার চেয়েও সুদূরপ্রসারী ঘটনা হলো 'বঙ্গবিভাগ'। বঙ্গবিভাগের নির্ণায়ক ঘটনাদুটির একটি অর্থাৎ কলকাতার 'মহাদাঙ্গার' কাহিনিই আমার আজকের উদ্দিষ্ট। প্রায় চুয়াত্তর বছর আগে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা বাঙ্গালি মানসকে আজও একইভাবে চিন্তা করতে, একই আত্মসমীক্ষা করতে তাড়িত করে।

চুয়াত্তর বছর আগে মাঝ আগস্টে টানা তিনদিন ধরে তৎকালীন বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী হুসেন শাহিদ সোহরাওয়াদির আমলে তাঁরই নেতৃত্বে হিন্দুদের উপর চলে লুট, নরহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন। কেউ কেউ এই নরসংহার পর্বকে কুখ্যাত 'দীর্ঘ ছুরিকার সপ্তাহ' বলে অভিহিত করেছেন। কলকাতার দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা দাঙ্গার চারদিন পরে তাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মহা নরসংহারকে 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' বলে অভিহিত করে। মুসলিম লিগের মাস্তান ও গুন্ডাদের তাণ্ডবে প্রাণ হারায় সরকারি হিসেবমতো প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি। বেসরকারি হিসেবে ৪০,০০০ থেকে ১,১০,০০০ হিন্দু। হাজার হাজার হিন্দু নিগৃহীত হয়েছিল। আর এক লক্ষ কুড়ি হাজারের বেশি মানুষ গৃহহীন হয়েছিল। কলকাতার এই মহাদাঙ্গার কুখ্যাত নায়ক ছিলেন মুসলিম লিগের জিন্নাহর সহকর্মী তথা নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হাসান শাহিদ সোহরাওয়ার্দি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরে মার্কসবাদী, নেহরুপন্থী এবং ইসলামি লেখক ও ঐতিহাসিকেরা সোহরাওয়ার্দির এই ঘৃণ্য অপরাধকে 'শ্বেতরঙে চুনকাম' করে তাঁকে এক সম্মাননীয় নায়কে পরিণত করেছে। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম নগরী কলকাতাকে সোহরাওয়ার্দি চেয়েছিল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে। যেহেতু কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তাই সোহরাওয়ার্দির পরিকল্পনা ছিল কলকাতা ও সন্নিহিত জেলাগুলিকে হিন্দুদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা। তাঁর দৃষ্টিতে, সেটা করা সম্ভব হিন্দু হত্যা ও বড়ো আকারে দাঙ্গার মাধ্যমে হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে। সেজন্য আগে থেকেই নানা ব্যবস্থা নিয়েছিল সোহরাওয়ার্দি। আগে কলকাতা ও বাঙ্গলার পুলিশ নিয়োগ হতো মূলত উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ভোজপুর অঞ্চলের আরা, বালিয়া, ছাপরা, দেওরিয়া প্রভৃতি জেলা থেকে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে মেদিনীপুরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর চরম নির্যাতন চালানো আইসিএস পুলিশ অফিসার নিয়াজ মহম্মদ খাঁকে সোহরাওয়ার্দি নির্দেশ দিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের নিষ্ঠুর ও নির্মম পঞ্জাবি মুসলমান ও পাঠানদের পুলিশে নিয়োগের ব্যবস্থা করে। যাইহোক, ১৯৪৬-এর প্রথমদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ভারতে তিন সদস্যের এক প্রতিনিধিদল যা 'ক্যাবিনেট মিশন' নামে পরিচিত তাঁদের পাঠিয়েছিলেন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি স্থির করার জন্য। কিন্তু জিন্নাহর চাপে পড়ে ১৬ জুন এক বিকল্প প্রস্তাব পেশ করে অবিভক্ত ভারতকে হিন্দুপ্রধান ভারত এবং মুসলমানপ্রধান পাকিস্তানে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়। কংগ্রেস সরাসরি এ প্রস্তাব বাতিল করে এবং ১০ জুলাই কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু মুম্বইয়ের এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন যে কংগ্রেসের 'সংবিধান সভা'তে যোগদান করতে রাজি আছে কিন্তু তাঁরা প্রয়োজনবোধ করলে 'ক্যাবিনেট মিশনের' প্রস্তাবগুলি সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারে। এই ঘোষণা জওহরলালের পক্ষে এক বিরাট ভুল পদক্ষেপ। আগেভাগেই এই ধরনের ঘোষণা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। জওহরলালের এই ঘোষণায় জিন্না প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয় এবং তাঁর ধারণা হয়, ভবিষ্যতে কংগ্রেস সংবিধান সভায় হিন্দু সংখ্যাধিক্যের জোরে

কলকাতার দাঙ্গায় এভাবেই ভ্যানচালক রিক্সাচালকদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

ভারতবর্ষ বিভক্ত করার প্রস্তাব বাতিল করে দেবে এবং মুসলমানদের হিন্দু-আধিপত্যে থাকতে বাধ্য করবে। ক্রুদ্ধ জিন্না ২৯ জুলাই মুসলিম লিগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডেকে দুটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। প্রথমত, মুসলিম লিগ ১৬ জুনের 'ক্যাবিনেট মিশন' প্রস্তাব গ্রহণের স্বীকৃতি বাতিল করে এবং দ্বিতীয়ত, 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'র কর্মসূচি ঘোষণা করে। তাঁরা ঘোষণা করে, তাঁরা সরকারের সঙ্গে সমস্ত সহযোগিতা বন্ধ করে দেবে এবং সমস্ত সাংবিধানিক পন্থা বর্জন করবে। জিন্না আরও ঘোষণা করে, এরপর থেকে তাঁরা নানা সমস্যা সৃষ্টি করবে এবং শপথ গ্রহণ করে, 'I will have India divided or India burned.' এই বৈঠকেই জিন্না ১৬ আগস্টকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' বা 'ডে অব ডেলিভারেন্স' বা 'নিষ্কৃতি দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। ওইদিন মুসলমানদের সাধারণ হরতাল পালনের আহ্বান জানানো হয় যাতে করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সমঝে দেওয়া যায় তাঁদের পাকিস্তান গঠনের ঐকান্তিকতা সম্পর্কে। কিন্তু বামপন্থী ঐতিহাসিকরা আওরংজেবের মতোই জিন্নাকেও সহনশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু কলকাতার দাঙ্গা তাঁকে গোঁড়া ইসলামপন্থী হিসেবে প্রতিভাত করেছে। জিন্নাহ জেনেবুঝেই ১৬ আগস্টকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' হিসেবে ঘোষণা করেছিল। কারণ ওইদিনের সঙ্গে ইসলামের তথাকথিত বিজয়ের সম্পর্ক ছিল। ১৯৪৬-এর ওইদিন ছিল রমজান মাসের অষ্টাদশ দিন এবং ওইদিনই হজরত মহম্মদ 'বদরের রক্তাক্ত যুদ্ধ' শুরু করেছিলেন অমুসলমান 'হিদেন'দের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে জয় ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই যুদ্ধ জয়ের ফলে মক্কা হজরত মহম্মদের অধিকারে আসে। মুসলমানদের 'জিহাদ' বা ধর্মযুদ্ধে আহ্বান করার এটাই উপযুক্ত দিন বলে মনে করেছিল জিন্নাহ ও তাঁর সাগরেদ হোসেন শাহিদ সোহরাওয়ার্দি। বাঙ্গলায় জিন্নার সাগরেদ সোহরাওয়ার্দি ও তাঁর সঙ্গীরা বদরের যুদ্ধজয়ের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে উত্তেজক বক্তৃতা করতে লাগলেন কলকাতা জুড়ে। পয়গম্বরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৬ আগস্টের দিন ইসলামের জয়ের জন্য সবাইকে উত্তেজিত করলেন। মুসলিম লিগের মুখাপত্র 'The Star of India'র ১৩ আগস্ট সংখ্যায় কীভাবে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালন করতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশাবলী প্রকাশিত হলো। ওই পত্রিকায় লেখা হলো, "Muslims must remember that it was in Ramzan that permission for jehad was granted be Allam. It was in Ramzan that the Battle of Badr, the first open conflict between Islam and heathens, was fought and won by 313 Muslims and again it was in Ramzan that 10,000 Muslims under the Holy Prophet conquered Mecca and established the kingdom of Heaven and the commonwealth of Islam in Arabia. The Muslim League is fortunate that it is starting its action on this Holy month and day." সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, সোহরাওয়ার্দি ও জিন্নারা ১৬ আগস্টের দিনটিকে পুরোপুরি একটা 'জিহাদ' বা ধর্মযুদ্ধের চেহারা দিতে সচেষ্ট ছিল শুরু থেকেই। সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ কলকাতার সমস্ত মসজিদের ইমামদের নির্দেশ দেয় ওইদিন অর্থাৎ শুক্রবার জুম্মার নমাজের শেষে তাঁরা যেন সমস্ত মুসলমানকে পাকিস্তান সৃষ্টিতে যোগদান করতে আহ্বান জানান। মসজিদের ইমামরা এটাকে কলকাতার হিন্দুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ হিসেবেই গ্রহণ করেছিল এবং সেইভাবেই বিষয়টি প্রচার করেছিল। ঐতিহাসিক প্যাট্রিক ফ্রেঞ্চ তাঁর পুস্তক Liberry or Death : India's Journey of Independence & Division গ্রন্থে লিখেছেন, "Surahwardy ran the Bengal. S.H.' League and his organisation had entrusted direct action to Calcutta's pirs and who were told to mobilise the Muslim community at Friday, mullahs prayers." ঐতিহাসিক যূথিকা রায়ের মতে, জিন্না কলকাতার ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন হিন্দুদের সন্ত্রস্ত করা ও দাঙ্গা চালানোর ব্যাপারে। সমস্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সোহরাওয়ার্দি হিংসা ও দাঙ্গায় বিশ্বাস করতেন এবং এজন্য সে এক বিশাল গুন্ডাবাহিনীর পৃষ্টপোষকতা করত। তাছাড়াও সে অতীব দুর্নীতিগ্রস্ত এবং শাসন পরিচালনায় অপদার্থ ছিল। এছাড়া তাঁর 'দিনলিপি' থেকে পাওয়া যায়, সে অত্যন্ত গোঁড়া ইসলামপন্থী ছিল এবং গোটা ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার স্বপ্ন দেখত। আর তরবারি হাতে জিন্নার ছবিযুক্ত পোস্টার কলকাতার বিভিন্ন মহল্লায় বিলি করা হয়েছিল। তৎকালীন কলকাতার মেয়র সৈয়দ মহম্মদ উসমান একটা লিফলেট সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিল যাতে ঘোষণা করা হয়েছিল,'কাফের!' তোদের ধ্বংসের আর বাকি নাই, আর তোদের সার্বিক হত্যাকাণ্ড ঘটেব!" বাঙ্গলাকে কাফের মুক্ত করার আহ্বানও জানানো হয়েছিল। তবে এটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের এই ঘোষণা সরকার, পুলিশ বা ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে ছিল না, এটা ছিল একান্তভাবেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে। এই দাঙ্গার প্রস্তুতিপর্বে ৫ আগস্ট ইংরেজি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় সোহরাওয়ার্দি 'শাহিদ' ছদ্মনামে এক প্রবন্ধে লেখেন, 'দাঙ্গা হাঙ্গামা এমনিতে খারাপ, কিন্তু তা যদি কোনো মহান আদর্শে করা হয় তাহলে সেটা অন্যায় নয়। এই মুহূর্তে মুসলমানদের কাছে পাকিস্তান দাবি আদায় করা এক পবিত্র কর্তব্য। মুসলমানদের হাতে তরবারি আছে, তা ব্যবহার করাই মুসলমানদের কাছে পবিত্র কর্তব্য।' (অনুবাদ স্বকৃত)। এদিকে জিন্নার ১৬ আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণার ফলে বাঙ্গলার তৎকালীন প্রধান সচিব আর এল ওয়াকারের পরামর্শে এবং সোহরাওয়ার্দির অনুরোধে বাঙ্গলার ব্রিটিশ গভর্নস্যার ফ্রেডারিক বারোজ ওই দিনটিকে ছুটির দিন ঘোষণা করে। বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সার্বজনীন ছুটি ঘোষণার বিরোধিতা করে। তাঁদের মতে, ছুটির ফলে লিগের গুন্ডারা জোরজবরদস্তি সবাইকে হরতাল পালনে বাধ্য করবে। বাঙ্গলার বিধানসভার কংগ্রেসের দলীয় নেতা কিরণশঙ্কর রায় ১৪ আগস্ট এক বার্তায় হিন্দু ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের হরতাল পালন না করে দোকান, ব্যবসা ইত্যাদি খোলা রাখার অনুরোধ করেন। যাইহোক, লিগের পূর্বপ্রস্তুতি মতো ১৬ আগস্ট জুম্মাবার নামাজের পরে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মেটিয়াবুরুজ, ২৪ পরগণা ইত্যাদি

বিভিন্ন মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে মুসলমানরা কলকাতার অক্টারলোনি মনুমেন্টের পাদদেশে সমবেত হয়। মুসলিম লিগের এই সভায় সভাপতিত্ব করে বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী তথা লিগ নেতা হোসেন শাহিদ সোহরাওয়ার্দি। বক্তা ছিল সোহরাওয়ার্দি, খাজা নাজিমুদ্দিন ইত্যাদি লিগ নেতা। কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুও প্রথম দিকে কিছুক্ষণ এই সভায় ছিলেন, পরে অবস্থা বেগতিক তেখে 'যঃ পলায়তি, স জীবতি' নীতি অনুসরণ করে পালিয়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শী অমিতাভ ঘোষ (আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষের পুত্র) লিখেছেন, ' The maidan meeting was attended by Jyoti Basu–the leader of the Communist Party of India which supported the creation of Pakistan. He ran away when the situation tended to go out of control.' সভার প্রত্যেক বক্তাই উপস্থিত সশস্ত্র মুসলমান জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য উত্তেজক বক্তৃতা দেয়। যদিও গণ্ডগোল শুরু হয় এই অনেক আগেই। প্রথম গণ্ডগোল শুরু করে হাওড়ার ঘুসুড়ি থেকে আগত একদল গুন্ডা। সকাল দশটার আগেই লালবাজারে গণ্ডগোলের খবর পৌঁছে যায়। মুসলমান গুন্ডারা বিভিন্ন অঞ্চলে জোর করে দোকান খুলতে বাধা দেয়। চারদিক থেকে ছুরি মারা, পাথর ছোঁড়া ইত্যাদি খবর এসে পৌঁছায়। এই খবরগুলি আসছিল মূলত উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল, যেমন রাজাবাজার, কলাবাগান, কলেজ স্ট্রিট, হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড), কলুটোলা, বড়বাজার, ফিয়ারস লেন ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। অক্টারলোনি মুমমেন্টের তলায় সভা শুরু হয় ২টো নাগাদ। সভায় উপস্থিত বেশিরভাগ লোকের হাতেই ছিল লোহার রড, বাঁশের লাঠি। উপস্থিত জনতার সংখ্যা আইবি রিপোর্ট অনুয়ায়ী ত্রিশ হাজার। কলকাতা পুলিশের এক ইন্সপেক্টরের রিপোর্টের হিসেবে পাঁচ লক্ষ এবং লিগ মুখপত্র 'দি স্টার অব ইন্ডিয়া'র হিসেব অনুযায়ী এক লক্ষ। সোহরাওয়ার্দির ভাষণে গণ্ডগোল চলাকালে পুলিশ ও মিলিটারি

কলকাতার অলিতে গলিতে এভাবেই মৃত মানুষের দেহ শকুনের খাবারে পরিণত হয়েছিল।

বাহিনীকে আটকে রাখার কথা বলা হয়েছিল। বাস্তবেও ঘটেছিল সেটাই। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের ফ্রেডারিক বারোজের কাছে পাঠানো এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ''He had been able to restrain the military and the police.'' তাঁর এই কথার বাস্তবায়ন করতেই সোহরাওয়ার্দি পরে কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টার লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের অফিসে বসে লাগামছাড়া এই দাঙ্গার নেতৃত্ব করে। ওই সভা শেষ হবার পরেই সমস্ত উত্তর ও মধ্য কলকাতা মুসলমান সশস্ত্র গুন্ডাদের হাতে চলে যায়। ধর্মতলার মোড়ের কমলালয় স্টোর লুট করা দিয়ে শুরু হয় লুটপাট, হত্যা। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায়। এবং গুন্ডাদের মুখে মুখে, 'নারায়ে তগদীর, আল্লাহ্-আকবর', 'কায়েদ-আজম জিন্দাবাদ', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ইত্যাদি স্লোগান। সশস্ত্র গুন্ডাভর্তি ট্রাক চলে আসে হ্যারিসন রোড ধরে। হ্যারিসন রোড ও মির্জাপুর স্ট্রিটের সংযোগস্থলে তারা হিন্দুদের দোকান ইত্যাদি আক্রমণ করতে উদ্যত হলে সেখানকার হিন্দুরা রুখে দাঁড়ায়। আবার ১৭ তারিখে মেটিয়াবুরুজের লিচুবাগান বস্তিতে কেশোরাম কটন মিলের প্রায় ৩০০ ওড়িয়া হিন্দু শ্রমিককে গার্ডেনরিচ টেক্সটাইল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সৈয়দ আবদুল্লা ফারুকি এবং এলাকার জেহাদি গুন্ডাদের নেতৃত্বে হত্যা করা হয়। পরে ওড়িয়া শ্রমিকদের হত্যার বিষয়টি তদন্ত করতে ওড়িশার মন্ত্রী বিশ্বনাথ দাশ এসেছিলেন। ১৭ তারিখ অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনেই মুসলমান গুন্ডারা বিভিন্নস্থানে নির্মম ভাবে হত্যাকাণ্ড চালায়, তাতে অসংখ্য হিন্দু মারা যায়। এই দাঙ্গার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এই দাঙ্গায় সম্প্রতি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি হিসেবে নির্বাচিত শেখ মুজিবুর রহমানের সক্রিয় অংশগ্রহণ। মুজিবুর তখন ইসলামিয়া কলেজের (বর্তমানে মৌলানা

আজাদ কলেজ) ছাত্র এবং বেকার হস্টেলের আবাসিক। সোহরাওয়ার্দির ডান হাত মুজিবুর তখন মুসলিম লিগের ছাত্র শাখার সম্পাদক ও জঙ্গিনেতা। বাম ঐতিহাসিকেরা অবশ্য মুজিবুরের রক্তাক্ত হাত ধুইয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। ওই দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় দক্ষিণে বউবাজার স্ট্রিট, পূর্বে আপার সার্কুলার রোড (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড), উত্তরে বিবেকানন্দ রোড এবং পশ্চিমে স্ট্যান্ড রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চল। লিগের ছাত্র শাখার নেতৃদ্বয় জি জি আজমিরি, শেখ মুজিবুর রহমান, শোভাবাজারের লালবাগান বস্তির ত্রাস হাবু গুন্ডা অর্থাৎ হাবিবুর রহমান, নিউ মার্কেট এলাকার কুখ্যাত মুসলমান দুষ্কৃতী বোম্বাইয়া, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিটের মিনা পাঞ্জাবি ও হ্যারিসন স্ট্রিট এলাকার কুখ্যাত গুন্ডা মুন্না চৌধুরীদের নেতৃত্বে হিন্দুর রক্তে কলকাতার রাস্তা লাল হয়ে যায়। মন্ত্রীদের নামে পেট্রোলের জন্য কুপন দেওয়া হয়েছিল আগেই যাতে পেট্রোলবোমা তৈরি করে রাখা যায়। অন্যান্য অঞ্চলেও বিক্ষিপ্তভাবে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। দাঙ্গা দক্ষিণ কলকাতার কিছু অংশেও।

১৬ থেকে ১৮ আগস্ট এই তিনদিন ভীষণ দাঙ্গার মধ্যে থাকে কলকাতার নাগরিকেরা, ১৯ থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত চলে বিক্ষিপ্তভাবে। ২১ আগস্ট ভাইসরয়ের শাসন জারি করা হয়। অবশেষে ২২ আগস্ট থেকে দাঙ্গা থামে। এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আর কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি দিকপাত করেই এই প্রবন্ধের ইতি টানব।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি থেকে একটা বিষয় নিশ্চিতরূপেই প্রমাণিত যে, এই দাঙ্গা মুসলিম লিগ ও তার নেতা হোসেন শাহিদ সোহরাওয়ার্দির পূর্বপরিকল্পিত। দীর্ঘদিন আগে থেকেই দাঙ্গার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় আরও একটি বিষয় হলো, মোহনদাস গান্ধী তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান ঋত্বিকের মতো ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশভাগ তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়েই একমাত্র হতে পারে, তিনি কিন্তু অভূতপূর্ব এই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় নিশ্চুপ রইলেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কোনো বিবৃতি দেবার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। জওহরলাল নেহরু তখন ক্ষমতা পাওয়ার নেশায় মশগুল, তিনি ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে ব্যস্ত রইলেন অস্থায়ী সরকার গঠনে আর সেজন্য মুসলিম লিগের সঙ্গে দরদারিতে। 'বাপু'গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর কলকাতা এসে দাঙ্গাবিধ্বস্ত নাগরিকদের দুর্দশা দেখার সময়ই হলো না!

কলকাতার হিন্দুদের এই চরম দুর্যোগের দিনে হিন্দুদের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন দুজন হিন্দু— বউবাজারের মলঙ্গা লেনের গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গোপাল পাঁঠা) এবং বেলেঘাটার যুগলচন্দ্র ঘোষ। গোপাল পাঁঠার নাম কলকাতার মুসলমানদের মনে ও হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল দাঙ্গার তৃতীয় দিন, ১৮ আগস্ট থেকে। দুর্যোগের সেইদিনে গোপলের 'ছুরি'র ব্যবহার এক প্রাণী (ছাগল) থেকে অন্য প্রাণীতে (মুসলমান) বদলে গিয়েছিল। গোপাল ঘোষণা করেছিলেন, "প্রতিটি মৃত হিন্দুর মৃতদেহের বিনিময়ে আমি দশজন মুসলমানের মৃতদেহ চাই। ছেলেরা এগিয়ে যাও, কোনো দয়া দেখাবে না।" গোপাল শুধু তরবারি ও ছুরি ব্যবহারেই সন্তুষ্ট ছিল না, আমেরিকান সৈন্যদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রও জোগাড় করে তা ব্যবহার করেছিলেন। তিনি এইসব অস্ত্র এমন দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন যে, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যে থেকে মুসলমানদের মনে কাঁপুনি ধরে যায়। এতটাই যে, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের অন্যতম শীর্ষনেতা এবং কলকাতা তথা বাঙ্গলার অনেক হিন্দু গণহ্যাতর কুখ্যাত নায়ক, গোলাম রসুল গোপালের কাছে এসে কাতরকণ্ঠে বলেছিল, "বহত খুন বহ চুকা... হামারি তরফ সে ভি আউর আপকি তরফ সে ভি। আব ইস কতল-ই-আম কো রোকনা হোগা। হাম আউর খুনখারাবে কে লিয়ে তৈয়ার নহি হ্যাঁয়। হাম সিজফায়ার কে লিয়ে তৈয়ার।" ঐতিহাসিক ভাবে, এটাই সাধারণত মুসলমানরা করে থাকে! প্রবল বাধা ও প্রবল প্রতিআক্রমণের মুখে পড়লে সবসময়ই তাঁরা দয়া ও শান্তির কথা বলে থাকে; অন্য সময় যমের এরা জল্লাদ। তৃতীয় দিনে গোপাল মুখোপাধ্যায় এবং বেলেঘাটার যুগলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে প্রবল হিন্দু প্রতিরোধের মুখে পড়ে এবং মুসলমানদের মার খাওয়া দেখে নাটেরগুরু সোহরাওয়ার্দিও চিন্তিত হয়ে পড়ে, হিন্দুদের সঙ্গে রফার কথা তাঁর মাথায়ও আসে। সে নিজের মসনদ বাঁচাতে এবং হিংসা থামাতে দুই মাস্তান তথা মুসলিম লিগ ও মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের নেতা জি জি আজমেরি ও মুজিবুর রহমানকে (যে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সৃষ্টিকর্তা) সন্ধির জন্য গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠান। গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে তাঁরা হত্যাকাণ্ড থামাতে অনুরোধ জানান। গোপাল মুখোপাধ্যায় শর্ত দেন, প্রথমে মুসলিম লিগের 'কিলিং স্কোয়াডকে' নিরস্ত্র করা এবং হিন্দুদের উপর আক্রমণ থামাতে হবে। নিরুপায় সোহরাওয়ার্দি দুটি শর্তই মেনে নেয়। আসলে, ঐতিহাসিকদের মতে, গোপাল পাঁঠার নেতৃত্বে হিন্দু ও শিখদের তীব্র প্রতিরোধ মুখে সোহরাওয়ার্দি ও তাঁর সাগরেদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। তাছাড়া তাঁর মনে হয়েছিল, ব্রিটিশ ভাইসরয় অর্কিবল্ড ওয়াভেল তাঁর সহ্যের সীমায় পৌঁছে গেছে এবং তাঁর সরকার ভেঙে দিতে পারে। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। ২১ আগস্ট লর্ড ওয়াভেল তাঁর সরকার বরখাস্ত করে দেয়।

কলকাতার ৪৬-এর দাঙ্গা হিন্দুদের দুটি শিক্ষা দেয়। প্রথমত, মুসলিম লিগের প্রচণ্ড হিন্দুবিরোধী নীতি ও ধ্বংসাত্মক কাজ হিন্দুদের সচেতন করে দেয় এবং দ্বিতীয়ত, হিন্দুরা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে মুসলমানরা পিছু হটতে বাধ্য হবে। আরেকটা বিষয়ও শিক্ষণীয়, মুসলমানরা যেমন তাঁদের ধর্ম রক্ষাকারীদের বীর হিসেবে গণ্য করে, শ্রদ্ধা করে, হিন্দুদেরও সেইভাবে যারা ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে তাঁদের বীর হিসেবে গণ্য করে শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে, গোপাল মুখোপাধ্যায়দের দিতে হবে উপযুক্ত সম্মান।

শেষে কবি রবীন্দ্রনাথের গানের কথা উচ্চারণ করে বলি, 'যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই, শয়নে, স্বপনে।' ■

১৯৪৬-এর কলকাতা দাঙ্গা ফিরে দেখা

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

মুসলিম লিগ ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট জুম্মাবারে (শুক্রবার) সারা ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (ডাইরেক্ট অ্যাকশন)-এর ডাক দেয়। অখণ্ডিত বঙ্গপ্রদেশে তখন 'কলকাতার কসাই' হিসেবে পরিচিত কুখ্যাত হোসেন সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে মুসলিম লিগের সরকার। তখনকার কলকাতার প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' তার ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় লেখে যে, 'লিগ বহুদিন ধরেই ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। প্ররোচনামূলক লক্ষাধিক পুস্তিকা বিতরণ করা হয়।' এরকমই একটি উর্দু পুস্তিকাতে লেখা হয় যে, ''এই রমজান মাসেই ইসলাম ও কাফেরদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এই রমজান মাসেই আমরা মক্কায় জয়লাভ করি এবং সেখান থেকে মূর্তিপূজকদের তাড়িয়ে দিই। এই রমজান মাসেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আল্লার ইচ্ছানুসারে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ পাকিস্তান গঠনের জন্য জেহাদের ডাক দিয়েছে এই রমজান মাসেই।'' এই পুস্তিকাটিতে তখনকার কলকাতার মেয়র ও কলকাতা জেলা মুসলিম লিগের সম্পাদক মহম্মদ উসমানের স্বাক্ষরও ছিল। মুসলিম লিগ সরকার দাঙ্গাকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য ১৬ আগস্ট ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে। ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার তখন কলকাতাতেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর বর্ণনা ('হিস্ট্রোরি অব মর্ডান বেঙ্গল', পার্ট-২, পৃ. ২৯৯-৩০০) থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৫ আগস্ট রাতে মুসলিম লিগের স্বেচ্ছাসেবকরা কলকাতার মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে মিছিল করে জেহাদের ডাক দেয় এবং 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' স্লোগান তোলে। ১৬ তারিখ সকাল থেকে মানিকতলা, রাজাবাজার, মেছুয়াবাজার, টেরেটিবাজার, বেলগাছিয়া এবং অন্যান্য মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এই সময় তোলা বিভিন্ন ছবিতে দেখা গেছে যে, এইদিন ময়দানে মুসলিম লিগের সভায় উপস্থিত জনতা লাঠি, তরবারি, ছুরি ও অন্যান্য এই ধরনের অস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়। এই সভায় মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দ উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেয় এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য আহ্বান করে। মিছিল ফেরত উত্তেজিত জনতা হিন্দু দোকানগুলিতে লুঠ ও নির্বিচারে হিন্দু নিধন ও নারী ধর্ষণ চালাতে থাকে। সোহরাওয়ার্দি নিজে লালবাজারের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসে থেকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখেন। ১৬ তারিখ সন্ধ্যার মধ্যেই হিন্দুরা বুঝতে পারে যে মুসলিম লিগ সরকারের পুলিশ তাদের কোনোরকম সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। পাড়ায় পাড়ায় যুবকরা সংগঠিত হতে থাকে। লাঠি, ছোরা প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। ১৭ তারিখ সকালবেলা হিন্দু পাড়াগুলোতে মুসলমান আক্রমণ তারা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কোথাও কোথাও পালটা আক্রমণও শুরু হয়। ১৮ তারিখ মূলত বাঙ্গালিদের নেতৃত্বে মুসলমান অঞ্চলগুলিতে ভয়াবহ আক্রমণ নামিয়ে আনে। আপাতশান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট, শিক্ষিত বাঙ্গালির এই ভয়াল, ভয়ংকর প্রতিরোধে মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দ স্তম্ভিত হয়ে যায়। মুসলিম লিগের দীর্ঘ শাসনে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বাঙ্গালি হিন্দু নিজেদের প্রাণ ও মা-বোনেদের ইজ্জত বাঁচাতে একদম মরিয়া হয়ে ওঠেছিল।

বদরুদ্দিন আহমেদ তাঁর 'স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনি' গ্রন্থে দেখিয়েছেন

আইন পরিষদে বিতর্কের সময় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তীব্র ভাষায় অভিযোগ

করেছিলেন, লিগ সরকার শহরটাকে দাঙ্গার কদিন গুন্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। সোহরাওয়ার্দি তাই শুনে শ্যামাপ্রসাদকেই গুন্ডা বলেন। শ্যামাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে পালটা জবাব দেন, আমি গুন্ডা হতে পারি, কিন্তু আপনি হলেন গুন্ডাদের সর্দার।

যে, অখণ্ড বাঙ্গলার মুসলিম লিগের সভাপতি নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, 'আমাদের লড়াই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে'। আবুল মনসুর আহমেদ-এর মতে, নাজিমুদ্দিনের প্ররোচনাময় বিবৃতির প্রতিক্রিয়ায় 'হিন্দুরা সন্ত্রস্ত ও শেষ পর্যন্ত অ্যাগ্রেসিভ হইয়া উঠিল' ('আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', পৃষ্ঠ-২৫৩)।

ইতিহাসবিদ সুরঞ্জন দাস তাঁর 'Communal Riots in Bengal 1905-47' গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্র উদ্ধৃত করে কলকাতা দাঙ্গার প্রস্তুতির এক বিশাল বর্ণনা দিয়েছেন। গুন্ডা অধ্যুষিত বস্তিতে বস্তিতে মুসলিম লিগ নিয়মিত সভা করতে থাকে দাঙ্গার কয়েকদিন আগে থেকে। বেশ কিছু সভায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি নিজে উপস্থিত ছিলেন। কামারদের দিয়ে ছোরা-বল্লম ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করিয়ে নেওয়া হয়, ছোরাছুরি শান দেওয়ার কাজ চলতে থাকে। মুসলমান ছাত্রদের হোস্টেলে কেরোসিন, মেথিলেটেড স্পিরিট ও অস্ত্র জমা করা হয়। মুসলমানদের দোকানে দাগ দিয়ে রাখা হয়, যাতে সেগুলো লুঠপাটের শিকার না হয়। মুসলিম লিগ সরকারের তরফ থেকে লিগ ক্যাডারদের পেট্রোল-কেরোসিন জোগান দেওয়া হয়। মসজিদে মসজিদে সভা চলতে থাকে। বেশিরভাগ থানা থেকে হিন্দু পুলিশ অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এক কথায় পুরোদস্তুর একটি গণহত্যার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এছাড়া দাঙ্গার কয়েকদিন আগে থেকেই পাড়ায় পাড়ায় লরিতে করে ঘুরে লিগ ক্যাডাররা স্লোগান দিতে থাকে 'আল্লা হো আকবর। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।'

'প্রবাসী' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৫৩) লেখা হয় মুসলমানদের পক্ষ থেকে একতরফা ''নরহত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডের পর হিন্দু ও অন্যান্য লোকেরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় এবং যেখানে সম্ভব সেখানেই তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে।'' নির্মলকুমার বসু তাঁর 'My Days with Gandhi'-তে লিখেছেন, ''The offensive began from the side of the Muslim mobs, but within a few hours the Hindus...also struck back.'' সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, তালতলা অঞ্চলে হিন্দু বাড়ির ওপর আক্রমণ শুরু হলে তা প্রতিহত করেন কংগ্রেস নেতা বিজয় সিংহ নাহার ও স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা। নাহারবাবু নিজেই লাঠি হাতে জনতার সামনে দাঁড়ান। এরপর তিনি স্থানীয় হিন্দু যুবকদের নিয়ে একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁকে সাহায্য করেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ইন্দুভূষণ বিদ ও দেবেন দে। এছাড়া বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, গোপাল মুখোপাধ্যায়, রাম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ হিন্দু প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

মেটিয়াবুরুজে বিহারি ও ওড়িয়া শ্রমিকদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে মুসলমান গুন্ডরা। দাঙ্গার দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ১৭ আগস্ট 'মডার্ন রিভিউ'-এর ভাষায় আক্রমণকারীরাই ওইদিন আক্রান্ত হয়ে পড়ে, হিন্দুরা দল বেঁধে মুসলমান মহল্লায় হানা দেয়। বামপন্থী অধ্যাপক সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা' গ্রন্থে লিখেছেন, ''দাঙ্গার পিছনে বাঙ্গলার মুসলিম লিগ সরকারের প্রত্যক্ষ মদত যে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সরকার থেকে দাঙ্গাকারীদের লরি, পেট্রোল, কেরোসিন জোগান দেওয়া হয়েছিল। ১৬ আগস্ট দিনের অনেকটা সময় সোহরাওয়ার্দি নিজে লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসে থাকেন এবং নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ সত্ত্বেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। মিলিটারি নামানো হয় ১৭ আগস্ট রাতে, ততক্ষণে কলকাতা রণক্ষেত্র হয়ে গেছে। গভর্নরের (বারোজ) ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি সোহরাওয়ার্দিকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক, কিন্তু তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। গভর্নরের ভাষায়, ''The atmosphere was admittedly explosive and we realized and I impressed it on my CM and his colleagues-that the League were playing with fire.'' সোহরাওয়ার্দির ময়দান বক্তৃতা বরং প্রত্যক্ষ প্ররোচনার কাজ করে এবং তিনি নিজে লালবাজার কন্ট্রোল রুমে উপস্থিত থাকায় তাঁক এড়িয়ে কিছু করা পুলিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট যার উল্লেখ সুরঞ্জন দাস তাঁর বইয়ে করেছেন তাতে দেখা যায়, মিছিলকারীদের নিয়ে যাবার জন্য কর্পোরেশনের গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। ধৃত মুসলমান গুন্ডাদের ছেড়ে দেবার জন্য সোহরাওয়ার্দি নিজে তৎপর হন। ময়দানের সভায় তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া আছে, তারা হস্তক্ষেপ করবে না। লালবাজারে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফোন আসা সত্ত্বেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে হাঙ্গামা হতে পারে ধরে নিয়ে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স মজুত করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে করে মিছিলকারীদের জন্য খাবার, অন্যান্য জিনিসপত্র, এমনকী ছোরা-ছুরি, পেট্রোল, কেরোসিনও নিয়ে যাওয়া হয়।

কলকাতার দাঙ্গার জন্য মুসলিম লিগগেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেন মৌলানা আজাদ। ছাত্রনেতা আনিসুজ্জামান বলেন, ''আমরা দেখিয়াছি ময়দানের সভায় যাইবার জন্য মিছিলকারী ও লিগওয়ালারা ছোরা ও লাঠি-সহ সশস্ত্র হইয়া অবলীলাক্রমে রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ হিন্দুর দোকানসমূহ লুণ্ঠন করিতে করিতে যাইতেছে। আমরা আরও দেখিয়াছি, সশস্ত্র পুলিশ ইহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে আর মনের আনন্দে হাসিয়াছে।'' আনিসুজ্জামন আরও বলেন, ''একথা প্রত্যেক নিরপেক্ষ সজ্জন ব্যক্তি অকপটে স্বীকার করিবেন যে, দাঙ্গার জন্য মুসলিম লিগের নেতৃবৃন্দই একমাত্র দায়ী।'' লন্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকায় মন্তব্য করা

হয়েছিল যে, লিগ সরকার হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। কলকাতার 'দ্য স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় লেখে, এই দাঙ্গা 'A political demonstration of the Muslim League.'

আইন পরিষদে বিতর্কের সময় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তীব্র ভাষায় অভিযোগ করেছিলেন, লিগ সরকার শহরটাকে দাঙ্গার কদিন গুন্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। সোহরাওয়ার্দি তাই শুনে শ্যামাপ্রসাদকেই গুন্ডা বলেন। শ্যামাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে পালটা জবাব দেন, আমি গুন্ডা হতে পারি, কিন্তু আপনি হলেন গুন্ডাদের সর্দার ('the prince of the goondas')। সোহরাওয়ার্দিকে 'গুন্ডাদের মন্ত্রণাদাতা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়ও। মণিকুন্তলা সেনের ভাষায় 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জেনারেল' ছিলেন সোহরাওয়ার্দি। কমিউনিস্টরা বরাবরের মতোই এই সময়েও মুসলিম লিগের অপরাধ চুনকাম করতে অবতীর্ণ হয়। কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়, লিগের প্ররোচনার জবাবে কংগ্রেসও প্ররোচনাময় প্রচার চালিয়ে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক করে তোলে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, দেশপ্রিয় পার্কে ১৫ আগস্ট কংগ্রেসের জনসভার কথা (নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পরিচয়' পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩৫৩)। কিন্তু কংগ্রেস ওই সভায় ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছিল এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে বলেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপন্থী। এই বক্তব্যকে কখনই আপত্তিকর বা প্ররোচনামূলক বলা যায় না। তবে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার আসল ভূমিকাটা ছিল অন্য জায়গায়। লিগ বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য পাড়ায় পাড়ায় যখন হিন্দু প্রতিরোধ বাহিনী তৈরি হচ্ছিল, তখন দু'দলেরই স্থানীয় নেতা-কর্মীরা একে সাহায্য করে। Calcutta Municipal Gazette (২৪-এ আগস্ট, ১৯৪৬) অনুযায়ী কলকাতা, হাওড়ার রাস্তা থেকে মৃতদেহ পাওয়া গেছিল ৩,৪৬৮টি। এ থেকে অনুমান করা যায় যে এই দাঙ্গায় মৃত্যুর সংখ্যা কোনোমতেই ১০,০০০-এর কম ছিল না। মুসলিম লিগ এই দাঙ্গা শুরু করলেও পরে তারাই বেশি মার খেয়ে যায়। তাই কলকাতা দাঙ্গার প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয় নোয়াখালিতে। সেও এক রক্তাক্ত ইসিহাস।

(লেখক ইতিহাসের অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

কোচবিহারকেও পাকিস্তানভুক্ত করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল

সাধন কুমার পাল

রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা (১৮৬৬-১৯৩৫) রাজবংশী সমাজে পুনর্জাগরণের যে ঢেউ তুলেছিলেন তা রংপুর, কোচবিহার, অসম, বিহার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ১৯৪৬ সালে তুফানগঞ্জের ৩১নং জাতীয় সড়কের পাশে নদীর তীরে তিনদিন ব্যাপী বিরাট ক্ষত্রিয় মহাসম্মেলন হয়েছিল। এই সম্মেলনে রাজবংশী সমাজের মানুষ দলে দলে যোগ দিয়ে উপবীত ধারণ করেছিলেন। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণও যোগ দিয়েছিলেন এই মহাসম্মেলনে। তুফানগঞ্জের বর্তমান খেলার মাঠে দুর্গাপুজোও শুরু করেছিলেন স্থানীয় জনগণ। এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রায়সাহেব হিন্দু সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে রাজবংশী সমাজের আলগা হয়ে যাওয়া বাঁধন দৃঢ়ীকরণের যে কাজ তিনি শুরু করেছিলেন তার প্রত্যেক প্রভাব সমাজে নানা ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। যেমন কোচবিহারের ভারতভুক্তির সময় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মহল অসমের মতো স্থানীয়-বহিরাগত ইস্যুতে বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে বিভাজিত করে কোচবিহার রাজ্যকে পাকিস্তান ভুক্ত করাতে গিয়ে চরম ভাবে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে পাকিস্তান চলে যেতে বাধ্য হন। কোচবিহারের ইতিহাস পাঠ করলে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের পূর্ববঙ্গে যদি যোগেন মণ্ডলের মতো তপশিলি নেতার জায়গায় রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার মতো একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলিষ্ঠ সংগঠক জন্মাতেন তাহলে হয়তো দেশভাগের ইতিহাস অন্যরকম ভাবে লেখা হতো।

৫৬৩টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ৭টি রাজ্য তাদের ধর্মীয় জনবিন্যাস অনুযায়ী পাকিস্তানে ও বাকি ৫৫৪টি ভারতে যোগ দিয়েছিল। উত্তরপূর্ব ভারতের মণিপুর, ত্রিপুরা এবং বঙ্গপ্রদেশের কোচবিহারের যোগদানের বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছিল একেবারে শেষের দিকে। দিল্লি থেকে উত্তরপূর্ব ভারতের দূরত্বই যে এই সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। ভারত সরকার প্রথমদিকে উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিম ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তি নিয়েই ব্যস্ত ছিল। ইতিহাস বলছে সংযুক্তি নিয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্ত জটিলতা সামলে সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও দেশীয় রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নজর দিয়েছিলেন উত্তরপূর্ব ভারতের দিকে।

স্বাধীনতার প্রায় দু' বছর পরে দেশীয় রাজ্য কোচবিহার নবগঠিত ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়। ইতিহাসে স্বল্প আলোচিত হলেও এই দু'বছরে এখানে অনেক অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছিল। সে সময় দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে রাজ-সরকারের বাইরে কোনো সংবাদ বা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হতো না। এছাড়া রাজতান্ত্রিক বিধি-নিষেধের জন্যও রাজ্যের সংবাদ বাইরে যেতে পারতো না। ফলে এখানে ঘটে চলা ঘটনাবলী কলকাতা কেন্দ্রিক দৈনিক সংবাদপত্রে স্থান পেত না। তখন প্রতিবেশী জলপাইগুড়ি থেকে জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রিকা 'জনমত' প্রকাশিত হতো। ওই সময় জনমত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও চিন্তাবিদ ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল। ডাঃ সান্যাল অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কোচবিহারের সংবাদ প্রকাশ করতেন।

সে সময়ের কোচবিহারের উদ্বেগজনক ঘটনাবলী সম্পর্কে যে কোনো ধরনের আলোচনায় ডাঃ সান্যাল কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদগুলি এখন ঐতিহাসিক নথি হিসেবে গণ্য হচ্ছে। ১৩৫৪ সালের ২১ ভাদ্রের 'কোচবিহারে ধূমায়িত বহ্নি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ডাঃ সান্যাল লিখেছিলেন, ''মাথাভাঙায় স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশ্য ভাবে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হইয়াছে। দিনহাটা মহকুমার হাকিম আহাম্মদ হোসেন প্রধান কোচবিহারকে পাকিস্তানের সহিত যুক্ত করিতে মুসলমানদেরকে প্রকাশ্য সভায় প্ররোচিত করিয়াছে। ইহাও প্রচার হইতেছে যে হলদিবাড়ি শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত হইবে। কোনো সংবাদ যাহাতে রাজ্যের বাইরে না যাইতে পারে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে।''

কোচবিহার রাজ্যের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য চারুচন্দ্র ওই সম্পাদকীয়র শেষাংশে লিখলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হউক। হায়দরাবাদের অভিনয় কোচবিহার রাজ্যে যাহাতে ঘটিতে না পারে সে বিষয়ে এখন হইতেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের বল্লভভাই প্যাটেলকে অনুরোধ করি কুচবিহারের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে এবং আবশ্যক মতো বিধিব্যবস্থা করিতে।''

'জনমত'-এ প্রকাশিত খবরের জের কিনা বলা মুশকিল, তবে এই খবর প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। সেই প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৫ সালের ১৫ কার্তিক 'কুচবিহার সংবাদ' শিরোনামে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী (সে সময় এই নামেই সবাই জানতো) ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কুচবিহার সফরের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। কোচবিহারের অবস্থা

সরেজমিনে দেখার জন্যই ড. প্রফুলচন্দ্র ঘোষ সেখানে গিয়েছিলেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে তিনি কোচবিহার পৌঁছান এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ওইদিন বিকালেই তিনি রাজ্য প্রজা কংগ্রেসের এক সভায় বক্তব্য রাখেন। তিনি 'হিতসাধনী নেতাগণকে এবং সমবেত জনগণকে কুচবিহারী-ভাটিয়া কোনো পার্থক্য সৃষ্টি না করিতে উপদেশ দেন। হিতসাধনীর কোনো নেতা কুচবিহারকে অসমের সহিত যুক্ত করার অভিপ্রায় জানাইলে তাহাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন।'

১৯ সেপ্টেম্বর স্টেট কংগ্রেসের একটি জনসভায় ড. ঘোষ বক্তৃতা করেন। স্টেট কংগ্রেসের সভাপতি উমেশচন্দ্র মণ্ডল এবং সাধারণ সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। সভায় বিশ হাজার নর-নারী যোগদান করেছিলেন। কোচবিহারে অবস্থানের কালে হিতসাধনী সভার পৃষ্ঠপোষক, নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রীগণ এবং মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বহিরাগতদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কোচবিহারকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল যে হিতসাধনী সভার উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বিখ্যাত ভাওয়াইয়া সংগীত শিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহমেদ আত্মজীবনীতে (আমার শিল্পী জীবনের কথা, সৃষ্টি প্রকাশন, কলিকাতা-৯) হিতসাধনী সভার উল্লেখ রয়েছে। আব্বাসউদ্দিন লিখেছেন, 'যখন আমরা থার্ড ক্লাশে পড়ি তখন ফয়েজউদ্দিন একদিন তুফানগঞ্জে এল। স্কুলে যে কয়জন কুচবিহারী হিন্দু-মুসলমান ছিলাম সবাইকে খবর দিয়ে রায়ঢাক নদীর ওপাড়ে কুলক্ষেতে গিয়ে মিলিত হলাম। ফয়েজ বলল, 'দেখ আমরা কুচবিহারে কুচবিহারী ছাত্রদের দিয়ে 'কুচবিহার হিতসাধনী সভা' করেছি। উদ্দেশ্য আমাদের দাবি দাওয়ার উপরে জোর দেব, সর্বত্র সেবা সদনের শাখা খুলব এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাতে কুচবিহারী ছাত্রদের দাবি উপেক্ষিত না হয় তার ব্যবস্থা করব এবং আমাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হবে— কুচবিহার কুবিহারবাসীদের জন্য, অর্থাৎ বহিরাগত ভাটিয়াদের প্রভুত্ব আমরা এ রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করবো। এটা হচ্ছে শাখাসভা প্রধানসভা কুচবিহারে। কাজ হবে আমাদের খুবই গোপনে। বৎসরে একবার সভা হবে, যথাসময়ে খবর পাবে।'

বহিরাগত বা ভাটিয়াদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কারণ হিসেবে আব্বাসউদ্দিন লিখেছেন, 'কুচিবাহারবাসী হিন্দু-মুসলমান বহিরাগত বর্ণ হিন্দুদের দ্বারাই একরকম শাসিত। উকিল হাকিম, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, প্রফেসর, মাস্টার সব লাইনেই এদের কর্তৃত্ব।' ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

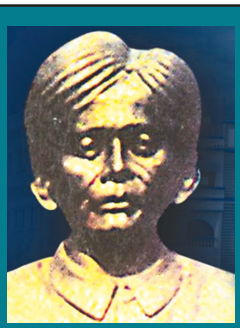

উত্তরবঙ্গের প্রাণপুরুষ পঞ্চানন বর্মা হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতার ছোবলের বিষ নীলকণ্ঠের মতো কণ্ঠে ধারণ করে রাজবংশী সমাজকে হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেদ অংশ হিসেবে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজীবন লড়াই করে গেছেন। দেশ ভাগের সময় রায়সাহেব বেঁচে না থাকলেও তাঁর কালজয়ী চিন্তা রাজবংশী সমাজকে পথভ্রষ্ট হতে দেয়নি।

'কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, 'মহারাজা হরেন্দ্রনায়ণের সময় (১৭৮৪-১৮৩৯) থেকে মূলত দক্ষিণ দেশীয় বর্ণ হিন্দুরা রাজার নামে দেশ শাসন করতেন। এই সময় বাঙ্গালিবাবুরা এ রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারী পদে নিযুক্ত ছিল।' ইতিহাস বলছে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারয়ণের (১৮৮৩-১৯১১) রাজত্বকালে কোচবিহারকে ঢেলে সাজানোর কর্মযজ্ঞে কর্মসংস্থানের প্রশ্নেও বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। মনীষী পঞ্চানন বর্মা (এমএবিএল) রাজবংশী সমাজের মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হয়েও রাজদরবার থেকে উপযুক্ত সম্মান পাননি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত কোচবিহার থেকে বহিষ্কৃত পর্যন্ত হতে হয়েছিল। সে সময় রাজপরিষদের কাজকর্ম ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনোরকম ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ ছিল না। কারণ কোনোরকম প্রতিবাদ বিক্ষোভের আভাস ইঙ্গিত পাওয়া গেলেই তা কঠোর হস্তে দমন করা হতো। এই কারণেই রাজশাসিত কোচবিহার কোনো রকম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেনি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে অবদমিত ক্ষোভকে ভিত্তি করে হিতসাধনী সভার মতো গোপন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পরিচালিত সংগঠন গড়ে ওঠা হয়তো স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

গায়ক আব্বাসউদ্দিনের জন্ম ২৭ অক্টোবর ১৯১০ সালে কোচবিহারের বলরামপুরে। ১৯১৪ কিংবা ১৯১৫ সাল নাগাদ তিনি হয়তো থার্ড ক্লাস অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীতে পড়তেন। সেই হিসেবে বলা যায় ১৯১৪-১৫ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গোপন সংগঠন হিসেবে হিতসাধনী সভা ক্রিয়াশীল ছিল। এই ঘটনার তিন দশক পরে

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সময় হিতসাধনী সভা কুচবিহার লাইনের মাঠে (বর্তমান রাসমেলার মাঠ) বিরাট সভার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। জনচেতনার প্রেক্ষাপটে এই সভাই ছিল কোচবিহার রাজ্যে প্রথম রাজহীন সভা এবং এখানে যেহেতু আর কোনো রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি ছিল না সেজন্য হিতসাধনী সভাই ছিল একমাত্র রাজকীয় রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত সংস্থা। গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীদের একাংশ এই সভার সদস্য ছিলেন।

কমলকান্তি গুহ তাঁর 'আমার জীবন আমার রাজনীতি' (দীপ প্রকাশন ,পৃঃ ১০) গ্রন্থে লিখেছেন, ''হিতসাধনী সভার উদ্দেশ্য হলো— বহিরাগত বা ভাটিয়াদের বিরুদ্ধে ভূমিপুত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করো, ক্ষেপিয়ে তোলো। স্বাধীনতার আন্দোলন, শোষিত মানুষের মুক্তির আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনাশ করো। বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দাও। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষে অবশ করে দাও ভূমিপুত্রদের চেতনাকে। এরই নাম হিতসাধনী সভা। মজার কথা, যারা রাজস্থান, বিহার বা অসম থেকে এসে কোচবিহার রাজ্যের অর্থনীতিকে কুক্ষিগত করেছে, শোষণের হালটি ধরে আছে বা গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতিতে থাবা বসিয়েছে— তারা কিন্তু হিতসাধনী সভার লক্ষ্য নয়।''

আনুষ্ঠানিক ভাবে কোচবিহারের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের প্রক্রিয়া যতই কাছাকাছি আসছিল হিতসাধনী দলে দুটি উপদল ততই প্রকট হয়ে উঠছিল। এই দলের মুসলমান সদস্যরা কোচবিহারকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। 'কোচবিহার রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তি ও অ্যাকাউন্টটেন্ট আসমত আহমেদ পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর জেলার লালমণির হাটে পাকিস্তানের লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন' (আনন্দ গোপাল ঘোষ ও শেখর সরকার প্রণীত কোচবিহার রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা, মধুপর্ণী- কোচবিহার জেলা সংখ্যা-১৩৯৬)।

ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ২৩.৫.৪৯-এ 'জনমত' পত্রিকায় লিখেছিলেন, ''কুচবিহারে হিতসাধনী সভা নামে একটি দল আছে। ইহারা চিরকাল 'ভাটিয়া খেদা' আন্দোলন করিয়া আসিয়াছে। বর্তমানে এই দলটিতে পাকিস্তানিদের পুরুমাত্রায় উস্কানি আছে। পূর্ব পাকিস্তান হইতে কয়েকজন মুসলিম লিগ নেতা এই দলে অংশগ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য স্টেট কংগ্রেসকে ধ্বংস করা।''

হিতসাধনী সভার প্রথম লক্ষ্য ছিল, 'বহিরাগত ভাটিয়াদের' রাজ্য শাসনের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া। এই কাজে সার্বিক ভাবে সফল হওয়ার পর হিতসাধনী সভার মুসলমান লবি পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি করণের ষড়যন্ত্র করেছিল। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর যখন ইংল্যান্ড সফররত ছিলেন তখন কোচবিহারের রাজস্বমন্ত্রী আমানতউল্লা খানচৌধুরী গোপনে পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলির সঙ্গে যোগাযোগ করে পাকিস্তানে যোগদানের কাগজপত্র তৈরি করে ফেলেন। এই মারাত্মক ষড়যন্ত্রের কথা ভারত সরকার টের পেয়ে যায়। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তড়িঘড়ি কোচবিহারের মহারাজাকে দিল্লিতে ডেকে আনেন' (সুকল্যাণ ভট্টাচার্য্য— 'উন্নয়নের জন্য নতুন রাজ্য সৃষ্টি কোনো সমাধান নয়, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৮.১০.২০০৫)। হিতসাধনী সভার লিগপন্থী নেতারা যখন কোচবিহারকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রাণপাত করছেন সেই সময় মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ নিজেই ২৮ আগস্ট, ১৯৪৯ নিঃশর্ত ভাবে রাজ্যের শাসনভার ভারত সরকারকে তুলে দিলেন।

১৯৪৭ সালের মে মাসে প্রকাশ্য সভার মাধ্যমে হিতসাধনী সভার আত্মপ্রকাশের দিনই গায়ক আব্বাসউদ্দিন গেয়ে উঠেছিলেন, 'ও ভাই মোর কুচবিহারীরে/ চতুর্দিকে দেখং সবুজ বাতি/ তোমার এলা ক্যানে আন্ধার রাতি?/ নিজের টোপলা নিজে নেও/ হাসিমুখ তোমার পরাদেও/ পরদেশি কী হয় আপনারে ও ভাই মোর কুচবিহারীরে।।' সন্দেহ নেই গানের মাধ্যমেই আব্বাসউদ্দিন কুচবিহারের মাটিতে দেশি ভাটিয়া বিভাজনের বিদ্বেষ বীজ বপন করেছিলেন। আব্বাসউদ্দিন সাহেব নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'গানটা গাওয়ার পর সভায় অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হলো। সেই গান সারা কুচবিহারে ছড়িয়ে পড়লো।' কিন্তু আব্বাসউদ্দিন সাহেব যখন দেখলেন হিতসাধনীর ভাইয়েরা কোচবিহারকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে ব্যর্থ হলেন তখন তিনি নিজেই তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে, 'ও ভাই মোর কুচবিহারীদের' ছেড়ে পূর্বপাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় চলে গেলেন। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ঢাকার পাকিস্তান রেডিয়োতে আব্বাসউদ্দিন সাহেব সর্বপ্রথম গেয়ে উঠলেন, ''সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা/ দুনিয়াতে ভাই সে কোন স্থান?/ পাকিস্তান সে পাকিস্তান।'' ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ সাল কোচবিহারের সিভিল সেসন জজ বজলে রহমান, বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হোসেন মহাম্মদ এরশাদের পিতা ও আইনজীবী মকবুল হোসেন, কোচবিহার রাজ্যের অর্থসচিব আনসারউদ্দিন আহমেদ, কোচবিহারের অর্থমন্ত্রী আমানতউল্লা খান চৌধুরী কোচবিহার থেকে বহিষ্কৃত হলেন। 'গজেন্দ্রনাথ বসুনিয়ার নেতৃত্বে অপর একটি অংশ 'ভাটিয়া তাড়াও' মন্ত্র সম্বল করে বিচ্ছিন্নতাবাদী পথ ধরে এগুতে থাকেন। এঁদের প্ররোচনায় ১৯৫২ সালে বাইশগুড়িতে দাঙ্গা হয়। তাতে অনেক মানুষ খুন হন। গজেন্দ্রনাথ বসুনিয়া গ্রেপ্তার হন' (সুকল্যাণ ভট্টাচার্য— 'উন্নয়নের জন্য নতুন রাজ্য সৃষ্টি কোনো সমাধান নয়, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৮.১০.২০০৫)। বিলুপ্ত হয় হিতসাধনী সভা। কংগ্রেস কমিউনিস্ট, কুচবিহার প্রজা মণ্ডল ওকুচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের কিছু ব্যক্তিত্ব কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। দুজন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব ব্যবহারজীবী গান্ধীবাদী উমেশ চন্দ্র মণ্ডল ও রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার স্নেহধন্য জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী উপেন্দ্রনাথ বর্মনও সে সময় পশ্চিমবঙ্গের

সঙ্গে কোচবিহারের সংযুক্তি করণের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার পক্ষে জনমত তৈরির জন্য সেসময় কলকাতায় 'কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তোলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে মুখ্য ভুমিকা পালন করেছিলেন তারাপদ চক্রবর্তী, পুলকেশ দে সরকার প্রমুখ। দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক ব্যারিস্টার অতুল চন্দ্র গুপ্তের উপস্থিতিতে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এই সংস্থার উদ্যোগে একটি সভাও হয়েছিল। এই সময় জওহলাল নেহরু কলকাতায় এসে একটি জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণে তিনি কোচবিহার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছিলেন প্রয়োজনে কোচবিহারে গণভোট নেওয়া হবে। তখন কোনো দেশীয় রাজ্যের সংযুক্তিকরণ নিয়ে গণভোট হয়নি। ইতিহাস বিশ্লেষকদের ধারণা কোচবিহার অসমের সঙ্গে না পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হবে এই টানাপোড়েন প্রসঙ্গেই হয়তো নেহরু গণভোটের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছিলাম। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গণভোটের প্রসঙ্গ তোলেননি; বরং জরুরি ভিত্তিতেই ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কোচবিহার রাজ্যের সংযুক্তকরণের কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। এই সংযুক্তিকরণের শেষ পর্বে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ব্যারিস্টার নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৪৯ সালের ২৮ আগস্ট সংযুক্তির পর মাত্র চার মাস 'সি' ক্যাটেগরি রাজ্য হিসেবে শাসিত হওয়ার পর ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের জেলা হিসেবে রূপান্তরিত হয়। ইতিহাস বিশ্লেষকদের ধারণা হিতসাধনী সভার মুসলিম লিগ পন্থীদের কুচবিহারকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার তৎপরতা না থাকলে এই রাজ্য এত দ্রুত পশ্চিমবঙ্গের জেলায় পরিণত হতো কিনা সন্দেহ।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এটাই যে, হিতসাধনী সভার মুসলমান সদস্যরা দেশি-ভাটিয়া (স্থানীয় ও বহিরাগত) বিদ্বেষের বীজ বপন করে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে

সাময়িক ভাবে ফাটল ধরানোর প্রক্রিয়ায় কিছু মানুষকে সঙ্গে পেলেও পাকিস্তানের সঙ্গে কোচবিহারের সংযুক্তির প্রশ্নে নমঃশূদ্র নেতা যোগেন মণ্ডলের মতো কাউকে পাশে পাননি। এর কৃতিত্ব অবশ্যই উত্তরবঙ্গের প্রাণপুরুষ পঞ্চানন বর্মাকেই দিতে হবে। কারণ তিনি হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতার ছোবলের বিষ নীলকণ্ঠের মতো কণ্ঠে ধারণ করে রাজবংশী সমাজকে হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেদ অংশ হিসেবে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজীবন লড়াই করে গেছেন। দেশ ভাগের সময় রায়সাহেব বেঁচে না থাকলেও তাঁর কালজয়ী চিন্তা রাজবংশী সমাজকে পথভ্রষ্ট হতে দেয়নি। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

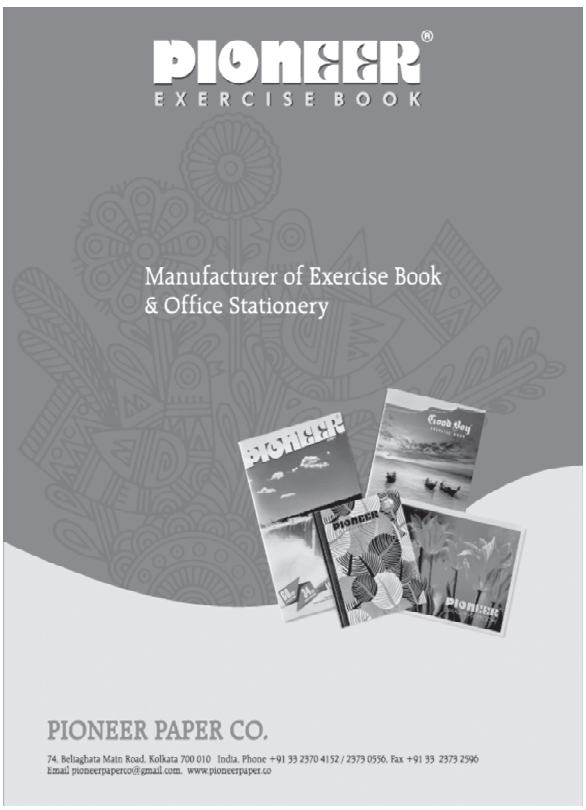

ভারতীয় নব জাগরণের জনক
লোকমান্য তিলক

বিনয় সহস্রবুদ্ধে

একটা সময় ছিল যখন সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করতেন জাতির পরিচয় নিয়ে আলোচনা একটি প্রাগৈতিহাসক বিষয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ধারণায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়। বহু সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করতে থাকেন মানুষের কর্মধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব পরিচয় তাকে অনুপ্রাণিত করে। এই সূত্রে অনেকেই মুম্বাই বা নিউইয়র্কের মতো শহরকে অন্য বহু জাতির মানুষের বৈশিষ্ট্যকে হজম করে ফেলার (meeting pot) বা একটি সংমিশ্রণ তৈরি করে দেওয়ার তত্ত্ব থেকে সরে আসেন। তাঁরা এই মিশ্র সহাবস্থানকে বরং খাবারের সঙ্গে পাশ্চাত্য কায়দায় যে স্যালাড পরিবেশন করা হয় সেই প্রতিতুলনা টানেন। ঠিকই, নতুন মিশ্রণ আখ্যা দেওয়ার অর্থ নানান ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর পরিচয়কে সম্পূর্ণ বিলোপ করে একটি নতুন পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর পূর্বোল্লেখিত 'স্যালাড পাত্রে' অবস্থানের অর্থ ছোটো ছোটো নিজস্ব পরিচয়ের জনগোষ্ঠীও স্বকীয়তা বজায় রাখার যথাযথ সংরক্ষণ পায়। তারা অন্যের সঙ্গে সহাবস্থান করেও পরিচয় চিহ্ন টিকিয়ে রাখতে পারে।

ভারতের ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও একই সঙ্গে সহাবস্থানের গুরুত্ব সম্ভবত প্রথম প্রকাশ্যে আনেন বালগঙ্গাধর তিলক। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই নিজস্ব পরিচয়ের ওপর জোর দিয়েই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী কিছুটা নির্জীব দেশবাসীর মনের মধ্যে প্রবেশ করার সম্ভাবনার কথা। একবার যদি তাদের স্বাভিমান জাগিয়ে তোলা যায় তাহলে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণে দ্বিধা করবে না। তাঁর 'স্বরাজ ও স্বদেশীর' জন্য আন্দোলনের আহ্বান এই কারণেই।

দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু 'স্ব' উদাহরণটি উপস্থিত

অর্থাৎ নিজ বা আপন। তিলকের মতে আত্মনির্ভর হওয়ার ভাবনার মধ্যেই সুপ্ত ছিল স্বাধীনতার সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার প্রথম সোপান। তিলক চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে যৌথ চিন্তা ও তাকে কাজে পরিণত করার ইচ্ছেকে উজ্জীবিত করতে। মানুষের চিন্তাকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে তিনি প্রচারমাধ্যমকে হাতিয়ার করেন। মরারাষ্ট্রে 'মারাঠী' ও 'কেশরী' নামে দুটি কাগজ প্রকাশ করেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একতার ভাবনাকে প্রসারিত করতে প্রতিষ্ঠা করেন Deccan Education Society. এই ভাবে শিক্ষিত মনন তৈরি করে তাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় করে তোলার যে ফর্মূলা তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন তা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। একই সঙ্গে শিক্ষা ও প্রচারমাধ্যমের এই যৌথ প্রয়োগ পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী ও বাবাসাহেব আম্বেদকর তার অনুসরণ করেছিলেন।

বাস্তবে তিলক ছিলেন সেই বিরল শ্রেণীর দার্শনিক-রাজনীতিবিদ। স্বরাজ ও স্বদেশী সম্পর্কিত তাঁর সহজ বিশ্লেষণ প্রত্যেকটি ভারতীয়কে তাদের ওপর ইংরেজের চাপিয়ে দেওয়া অপমান ও অবিচারের বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ করে তোলে। 'হোমরুল'-এর দাবি নিয়ে তাঁর আন্দোলন পরবর্তী সময়ে স্বরাজের আন্দোলনের উর্বর জমি প্রস্তুত করে দেয়। 'হোমরুলের' জন্য বিক্ষোভের উদ্দেশ্য বিষয়ে তাঁর ভাবনা ছিল স্পষ্ট। তিনি লিখেছিলেন একটি অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ও দাবির কথা— "India was like a son who had grown up & attained maturity. It was right now that the trustee or the fathar should give him what was his dul. The people of India must get this effected. They have a right to do so."

অন্যদিকে দুরদৃষ্টিসম্পন্ন এই মানুষটির মনে তখনই স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের রূপরেখার স্পষ্ট ছবি ছিল। তাঁর কাছে স্ব-রাজ শব্দটি বোঝাতে স্ব-ভাষা ও স্ব-ভূষা (বেশ) অর্থাৎ মাতৃভাষা ও স্বজাতির পোশাক পরিধান ছিল আবশ্যিক। তিনি প্রথম সর্বভারতীয় নেতা যিনি আলাদা ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি বিশদে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে মারাঠী, তেলুগু ও কন্নড় ভাষার ভিত্তিতে আলাদা আলাদা রাজ্য গঠন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাঁর পরিকল্পনায় শিক্ষার মাধ্যম যে মাতৃভাষাই হবে তা বলাই বাহুল্য। একজন অতি দক্ষ পরিকল্পনাকার হিসেবে এক্ষেত্রে ইংরেজ গণতন্ত্র ও সংবিধান (তাদের) মান্যতা নিয়ে বিশেষ অহংকার করত তিনি সেই ব্যবস্থারই পূর্ণ সদব্যবহার করে জাতির উপকারে প্রয়োগ করেছিলেন।

এই লক্ষ্য পূরণ করতে তাঁর সংবাদপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও আবেগের প্রয়োগ করতে প্রভূত সুবিধে হয়েছিল। তাঁর নিজ লিখিত সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলিতে জ্বালাময়ী তৎকালীন বিষয় উত্থাপিত হলেও তা ছিল নিকষ যুক্তিনিষ্ঠ ও আইনসিদ্ধ, যাতে না ব্রিটিশ প্রভু কোনো না কোনো ছিদ্রান্বেষণ করে আইনি প্রক্রিয়া শুরু না করতে পারে। আরও একটা জিনিস, রেখে-ঢেকে মলম দিয়ে কথা বলা তিলকের চরিত্রে ছিল না। শিক্ষা দীক্ষায় বিশিষ্ট পণ্ডিত তিলক স্বরাজের লক্ষ্য পূরণে তৃণমূল

স্তরে রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও সমাজে প্রয়োজনীয় মতামতের সমর্থন তৈরি করতে সফল হয়েছিলেন। এই সময় সরাসরি জনসমক্ষে নিজ বক্তব্য পেশ করতে তাঁর সমসাময়িক বহু কংগ্রেস নেতাই ভেতরে ভেতরে আশঙ্কিত ছিলেন। তাঁর এই 'স্বরাজের' স্বপ্ন কিন্তু কেবলমাত্র ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। জাতির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনার প্রকাশ ঘটানোর স্বাধীনতাও এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। সেই কারণেই জাতীয় নবজাগরণের জনক হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করা একেবারেই সঠিক। তাঁর দুটি অসামান্য প্রচেষ্টা শ্রীগণেশ উৎসব ও ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্মজয়ন্তী পালন করার প্রথার প্রবর্তনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মিলিত হওয়া। এই সূত্রে তাঁর 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে তিনি লিখেছিলেন, ''এই গণেশ উৎসব পালন করার প্রথা বহু প্রাচীন কিন্তু নতুন করে একে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্য হলো আগেকার মতো কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এখনকার উৎসবে সকলের অংশগ্রহণ কেউ আটকাতে পারবে না। এটি হয়ে উঠবে হিন্দুদের মিলন ক্ষেত্র। এই নিয়ে আমাদের গর্ব করা উচিত।

আর স্বদেশীর ব্যাপক প্রচলনের মধ্যেও ছিল বিশেষত্ব। জাতীয় জীবনে স্বদেশী ব্যবহারের কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন লালা লাজপত রায় ও বঙ্গপ্রদেশের বিপিনচন্দ্র পাল। এঁরাই তৎকালীন সময়ে এক ডাকে 'লাল-বাল-পাল' ত্রয়ী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, তাঁর স্বদেশীর পরিকল্পনা কেবলমাত্র বিলিতি দ্রব্য বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সমগ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও তাদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্যই বিলিতি বর্জন ও বিলিতি দ্রব্য পোড়ানোর মতো সহজ পন্থা চালু করেছিলেন। তাঁর অন্তর্নিহিত ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় উদ্যোগপতি তৈরি করা। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহ দেওয়া ছিল অন্যতম কারণ। প্রারম্ভিক মূলধন তৈরি করার উদ্দেশ্যে তিনি অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন এর নাম ছিল 'পয়সা ফান্ড'!

উদাহরণ হিসেবে তিনি প্রথমেই ঈশ্বরদাস বার্ষ্ণেয় নামে পুনের এক ব্যক্তির পেছনে দাঁড়িয়ে যান। তাঁর সুরাটে দেওয়া বক্তৃতা এই মর্মে এতটাই উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, বার্ষ্ণেয় তিলকের পৃষ্ঠপোষকতায় পুনেতে 'পৈইসা ফান্ড কাঁচ উদ্যোগ' নামে কারখানা খোলেন। এই একই উদ্দীপনা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে যখন তিলক জামশেদজী রতনজী টাটার সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'বোম্বে স্বদেশী সমবায় স্টোর কোম্পানি' তৈরি করেন। এখানে কেবলমাত্র ভারতে তৈরি জিনিসই বিক্রি হতো। টুটিকোরিনে চিদাম্বরম পিল্লাই নামে এক ব্যক্তি বড়ো আকারে প্রথম ১৯০৬ সালে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানি খোলেন। এই উদ্যোগের সাফল্য ব্রিটিশের বিখ্যাত British India steam Navigetion কোম্পানিকে ব্যবসা সম্পর্কে আশঙ্কিত করে তুলেছিল। তাঁর স্বদেশী ব্যবহারের ঐতিহাসিক উদাহরণ রয়ে গেছে মান্দালয় জেলে বসে তাঁর লেখা 'গীতারহস্য'-এর প্রকাশনা ক্ষেত্রে। তিনি জানিয়েছিলেন এই বই যেন কেবলমাত্র স্বদেশী পেপার মিল D Padnji & Sons-এর কাগজেই ছাপা হয় অন্যথায় নয়।

তাই, আজ যখন আমরা আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলি তা মূলত তিলকের সূচিত উদ্যোগেরই উত্তরাধিকার। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান ও বিভিন্ন সংস্কৃতি ও প্রথায় বিশ্বাসী ভারতবাসীকে সামাজিক ভাবে একসূত্রে বাঁধার পরিকল্পনার জনক লোকমান্য তিলকের শততম মৃত্যু বার্ষিকীতে তাঁকে প্রণাম।

(লেখক রাজ্যসভার সদস্য)

প্রবীণ প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ বলবন্ত মোতলগজীর জীবনাবসান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মোতলগজী গত ২ আগস্ট রাত্রি ৮টা ৫২ মিনিটে নাগপুরের প্রধান কার্যালয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের কাছে 'শ্রীকৃষ্ণদা' নামে পরিচিত ছিলেন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ১৯৬২ সালে তিনি প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করে অসম প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর নাগপুর প্রান্ত প্রচারক। ১৯৮১ সালে কলকাতায় আসেন। সহপ্রান্ত প্রচারক, প্রান্ত প্রচারক, ক্ষেত্র প্রচারক, অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৯ থেকে তিনি নাগপুর প্রধান কার্যালয়ে থাকতেন।

পরলোকে হাওড়া মহানগরের মধ্যভাগ সঙ্ঘচালক ডাঃ তরুণ চক্রবর্তী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসবক সঙ্ঘের হাওড়া মহানগরের মধ্যভাগ সঙ্ঘচালক ডাঃ তরুণ চক্রবর্তী করোনা আক্রান্ত হয়ে গত ২৭ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। রেখে গেছেন সহধর্মিণী, ২ কন্যা - জামাতা - দৌহিত্রী, আত্মীয়-পরিবার বর্গ, বহু চিকিৎসক সহকর্মী এবং অসংখ্য পরমাত্মীয়স্বরূপ স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা।

বাংলাদেশকে নিয়ে পাকিস্তানের খেলাটা ভয়ংকর ও বিপজ্জনক

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের টেলিফোন দুনিয়াজোড়া খবরের শিরোনাম হয়ে গেছে। ন' মাসের মধ্যে এটা দ্বিতীয় টেলিফোন ইমরান খানের। ন' মাস আগে টেলিফোন করার পর সংবাদপত্রে ছোট্ট খবর হয়, আলোচনা হয়নি। কিন্তু এবারের টেলিফোন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে দেশ ও বিদেশের গণমাধ্যমে। কারণ সময়টা ভিন্ন। আলোচনার ধরনটাও ভিন্ন।

উহান থেকে করোনা ভাইরাস সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পর সংক্রমণ ও মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হওয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে চীনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, চীন থেকে বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ প্রত্যাহার, বিভিন্ন দেশে পণ্যের বাজার সংকুচিত হওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনা ও দুনিয়াজোড়া ঘৃণার মধ্যে লাদাখে ভারতের ভূখণ্ড দখল করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কাকে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্ররোচিত করার মধ্যে ইমরান খানের টেলিফোন এল। পাকিস্তান তো জন্ম থেকেই ভারতের সঙ্গে বৈরী আচরণ করে চলেছে। পাকিস্তানের মাটি থেকে চলছে ভারতের ওপর জঙ্গি হামলা। সাম্প্রতিক সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবিধানিক মর্যাদা পরিবর্তনের পর পাকিস্তান আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে চীনের আস্থা অর্জন করেছে। নেপালের কমিউনিস্ট সরকার চীনের প্রতি অনুগত্য প্রমাণ করতে ভারতীয় ভূখণ্ডকে নিজের দাবি করে সংবিধান সংশোধন করেছে, রাম ও অযোধ্যা নিয়ে বিতর্কিত দাবি করে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ চীন সাগর চীনের আধিপত্য হুমকির মুখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে এশিয়ায় নিয়ে আসছে।

পাকিস্তানের মূলধারার গণমাধ্যমে দুই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ইমরান খানের ফোনালাপকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখা হয়েছে। বিবিসির মতে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে, পাকিস্তান বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রতিবাদে ২০১৬ সালে তাদের পার্লামেন্টে নিন্দাপ্রস্তাব পর্যন্ত পাশ করেছে, তারা কেন বাংলাদেশের নৈকট্যের জন্য এখন উদগ্রীব?

এই প্রেক্ষাপটে ইমরান খানের ফোন এবং ১৫ মিনিটের (পাকিস্তানি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে ২০ মিনিট বলা হয়েছে) আলোচনার বিষয়বস্তুর একাংশ স্বাভাবিকভাবে নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সেক্রেটারি এহসানুল করিম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২২ জুলাই বেলা ১টায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করেন। দুই নেতার ফোনালাপ ১৫ মিনিট স্থায়ী হয়। কুশলাদি বিনিময়ের পর ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতি ও সঙ্কট মোকাবিলায় সরকারের নেওয়া উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। এছাড়া বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী আলাপ করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান

নিজে থেকেই বন্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও উদ্যোগ প্রসঙ্গে জানতে চান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে চলমান বন্যার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এটি মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপের কথাও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

অন্যদিকে পাকিস্তানের সরকারি বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েট প্রেস অব পাকিস্তান (এপিপি) সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে উদ্ধৃত করে বলেছে, পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান এবং সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গভীর করতে পাকিস্তান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইমরান খান 'ভারত অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের প্রসঙ্গ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন এবং পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল গড়ে তুলতে জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন'। সার্কের প্রতি পাকিস্তানের সমর্থনের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যৌথভাবে আঞ্চলিক সহযোগিতা সৃষ্টি করে টেকসই শান্তি ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে সুবিধামতো সময়ে পাকিস্তান সফরেরও আমন্ত্রণ জানান।

এক দেশের প্রধানমন্ত্রী অন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে টেলিফোন করতেই পারেন। মহামারী কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুঃখদুর্দশার খোঁজখবর নেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু দেশ-বিদেশে এই টেলিফোন নিয়ে আলোচনার কারণ পাকিস্তানের বিবৃতিতে এমন কিছু বিষয় আছে যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারি উল্লেখ করেননি। হয়তো বিব্রতকর বলে উল্লেখ করেননি। পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী মানবিক দিক ছাড়াও কিছু রাজনৈতিক বিষয়ও টেনে এনেছেন। মানবিক বিষয়টি ছিল গৌণ, জম্মু-কাশ্মীর, সার্ক ও দু'দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়ই মূখ্য। যার কোনোটিই বাংলাদেশের বক্তব্যে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানের অন্যতম দীর্ঘ দৈনিক দি নেশন তাদের এক মন্তব্য প্রতিবেদনে ইমরান খান এবং শেখ হাসিনার টেলিফোন আলাপকে 'ডন অব এ নিউ এরা' অর্থাৎ পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্কে 'নতুন দিগন্তের সূচনা' হিসেবে বর্ণনা করেছে। প্রভাবশালী এই পত্রিকাটি বলছে, বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য পাকিস্তানের এখন সম্ভাব্য সবকিছু করা উচিত। পাকিস্তানের মূলধারার গণমাধ্যমে দুই প্রধানমন্ত্রীর এই ফোনালাপকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখা হয়েছে। বিবিসির মতে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে, পাকিস্তান বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রতিবাদে ২০১৬ সালে তাদের পার্লামেন্টে নিন্দাপ্রস্তাব পর্যন্ত পাশ করেছে, তারা কেন বাংলাদেশের নৈকট্যের জন্য এখন উদগ্রীব?

রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু বা বন্ধু বলে কিছু নেই, কথাটা সত্যি। কিন্তু বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের কথা এলে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে নির্যাতন-শোষণের দুই দশক এবং একাত্তরের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালিকে হত্যা ও চার লক্ষেরও বেশি মা-বোনকে নির্বিচারে ধর্ষণ, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে স্বাধীন বাংলাদেশকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না দেওয়ার ষড়যন্ত্র এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর উল্লাস ও হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খুনিদের অবৈধ সরকারকে স্বীকৃতি দান, একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচার নিয়ে আপত্তিকর, অনৈতিক ও নোংরা আচরণ— এই বিষয়গুলিকে সামনে রাখতেই হবে। পাকিস্তান বাংলাদেশে গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। ১৯৪৭ সালে সিমলায় শেখ মুজিবুর রহমান, ইন্দিরা গান্ধী ও জুলফিকার আলি ভুট্টোর মধ্যে স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে প্রতিশ্রুত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেনি এবং সম্পদ ভাগাভাগির বিষয়টি ফয়সালা করেনি। তারপরও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের দ্রুত উন্নতি চায় পাকিস্তান।

পাকিস্তানে সামরিক সমর্থন ছাড়া কেউ ক্ষমতায় যেতে পারে না, ক্ষমতায় থাকতেও পারে না। গণতন্ত্র সেখানে মুখোশ মাত্র। আপাতত ইমরান খান তাদের প্রতিনিধি, যদিও কোনো কারণে এই সম্পর্কে সাম্প্রতিক সময়ে চিড় ধরেছে বলে গণমাধ্যমে খবর এসেছে। সেই প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনায় সার্ক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানোর কথা উল্লেখ করেছেন। করোনা পরিস্থিতি জানতে চেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে। অথচ মাত্র কয়েক মাস আগে করোনা সংক্রমণের গোড়ার দিকে একটি সুন্দর ও মানবিক উদ্যোগেও পাকিস্তানের 'পাকিস্তানি চরিত্র' অত্যন্ত জঘন্যভাবে প্রকাশ পায়। 'প্রতিবেশী প্রথমে' নীতির অংশ হিসেবে এবং কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধ করার জন্য একটি সমন্বিত আঞ্চলিক উদ্যোগ নিতে গত ১৫ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে সার্ক নেতৃবৃন্দের একটি ভিডিয়ো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সার্ক দেশগুলির সরকার প্রধানগণ যোগ দিলেও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে যোগ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ গোড়াতেই এই মানবিক উদ্যোগটিকে ভালো দৃষ্টিতে দেখেনি পাকিস্তান, যেহেতু উদ্যোগটি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-সহ অন্যান্য সার্ক নেতৃবৃন্দ তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়েছেন। প্রাণঘাতী একটি ভয়ংকর রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও পাকিস্তান রাজনীতি নিয়ে আসে এবং হীনমন্যতার পরিচয় দেয়। ভিডিয়ো সম্মেলনেও 'নেতিবাচক' পরিচয় রাখে পাকিস্তান। সম্মেলন যখন সুন্দর ও কার্যকর পদক্ষেপের দিকে এগুচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তখনই কাশ্মীর প্রসঙ্গটি নিয়ে আসেন। তাও আবার নাটকীয়ভাবে। দৃশ্যটি সবারই চোখে পড়েছে অত্যন্ত কটুভাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বক্তব্য রাখছিলেন, এমন সময় দেখা যায় পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাঁ দিক থেকে এক ব্যক্তি এলেন, মন্ত্রীর সামনে থেকে একটি কাগজ উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। নিমেষেই ডানদিক থেকে একটি কাগজ এসে যায় মন্ত্রীর সামনে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন। এরপর তাঁর বক্তব্যে ঢুকে গেল কাশ্মীর। টেলিভিশনের পর্দায় সবাই দেখলেন। এমন অশোভন ও অনৈতিক কাজ পাকিস্তানের পক্ষেই সম্ভব। সার্ক সনদে কোনো দ্বিপক্ষীয় সমস্যা উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই। আর কোভিড-১৯-এর সমূহ বিপদ মোকাবিলা নিয়ে যেখানে বৈঠক সেখানে এই ঘটনাটি সার্ক নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইতিবাচক পরিচয় বহন করে না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সেই ইমরান খান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনায় সার্ক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা তুললেন, তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে 'কোনো কিছুর ছায়া' দেখতে পাওয়া যায়।

মাত্র মাসখানেক আগে আল কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে 'শহিদ' বলে উল্লেখ করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিরাপদ আশ্রয়ে অ্যাবোটাবাদে

গ্যারিসন টাউনে থাকা ওসামা ২০১১ সালে মার্কিন নেভি সিলের আকস্মিক এক অভিযানে নিহত হন। ইমরান খান ওসামাকে প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বোঝা যাচ্ছে সেনাবাহিনীর সর্বাত্মক আস্থা লাভে চেষ্টার কোনো খামতি নেই ইমরান খানের। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নাকানিচুবানি খাওয়ার পর লাদেনকে গোপনে আশ্রয় দিয়ে মার্কিন বাহিনীর হাতে দ্বিতীয়বার মানসম্মান খোয়ায়। একাত্তরে বাংলাদেশ- ভারত যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে প্রায় ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল আমির আলি খান নিয়াজি, তারই যোগ্য ভাতিজা ইমরান খান নিয়াজি।

তবে এবারে পাকিস্তানের খেলাটা বেশ বিপজ্জনক ও ভয়ংকর বলে মনে হচ্ছে। চীন সাম্রাজ্যবাদের নতুন মোড়ল হওয়ার যে স্বপ্ন দেখছে, গোটা এশিয়া জুড়ে দাপাদাপির চেষ্টা তারই ইঙ্গিতবহ। পাকিস্তান তাদের পুরনো বন্ধু, পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধিকারের লড়াই 'ভোটের আগে ভাত চাই' স্লোগান তুলে রুখে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। আইয়ুব খান-ইয়াহিয়া খানকে রক্ষার এই প্রেসক্রিপশন এসেছিল চীন থেকে, কিন্তু ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধ রুখতে ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয় চীনের অস্ত্রে, মদতে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষা পায়নি।

এবারও উদ্বেগটা একই কারণে। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি সাধনে পাকিস্তানের চেষ্টা হতেই পারে। কিন্তু উদ্বেগটা হচ্ছে, তার পেছনে যে ছায়াটা দাঁড়িয়ে আছে এবং মাথার ওপরে হাত রেখেছে তাকে নিয়ে। এই শক্তিটার আধিপত্যবাদী থাবা এখন গোটা বিশ্বকে দাপিয়ে বেড়াতে চায়, তাদের হাতেও একাত্তরে ৩০ লক্ষ বাঙ্গালি হত্যার রক্ত লেগে আছে, লক্ষ লক্ষ নারী নির্যাতনের আর্তনাদ এখনো কান পাতলে শোনা যায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। জাতিসঙ্ঘে দীর্ঘদিন আটকে রাখা হয়েছিল বাংলাদেশের সদস্যপদ। এসব হয়তো ইতিহাস, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের সঙ্গে হাঁটতে গেলে ইতিহাসের পাতা ওলটাতেই হয়। এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া আত্মঘাতী হতে পারে। কারণ পাকিস্তানকে চেনা, পেছনের ছায়াটাও বড্ড চেনা।

উদ্বেগ আরও আছে। কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের একটি সংবাদপত্রে এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দায়িত্বপালনরত উপদেষ্টাদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল উপদেষ্টার সংখ্যা বেড়েছে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী উপদেষ্টারা গুরুত্ব হারিয়েছেন এবং দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতার বলয়ে জোরালোভাবে উপস্থিত হয়েছে চীন। চীন-পাকিস্তানের যৌথ প্রয়াসে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে নতুন সমীকরণ এনেছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। যে কারণে বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশ- ভারতের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। যদিও দু'দেশ প্রকাশ্যে এখনো এ বিষয়ে কিছু বলতে রাজি নয়।'

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, '২০১৯ সালে বাংলাদেশের নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর থেকে ভারতীয় প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম পিছিয়ে পড়েছে। অন্যদিকে চীনের প্রকল্পগুলির ব্যাপারে উৎসাহ দেখা গেছে দৃষ্টিকটু পর্যায়ে। ভারতের উদ্বেগ সত্ত্বেও সীমান্তবর্তী সিলেট বিমানবন্দর সম্প্রসারণের প্রকল্প চীনা কোম্পানিকেই দেওয়া হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় ভারত সরকার বিভিন্ন সামগ্রী দিলেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে একটি ধন্যবাদ চিঠিও পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে চীনের একটি ডাক্তারের প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমানবন্দরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেনের উপস্থিতি ও বিদায় জানানোর সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের সংবর্ধনা নিয়ে নানা বিশ্লেষণ চলছে নয়াদিল্লির সাউথ ব্লকে। এর মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের এই নতুন মেরুকরণ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে ভিন্ন বিশ্লেষণ দাবি করছে। গত পহেলা জুলাই এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সাক্ষাতের খবর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনো মিডিয়ায় প্রচার না করলেও খবরটি প্রচারের জন্য পাকিস্তান হাইকমিশনের বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল লক্ষণীয়।'

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, '২০১৮-১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাকিস্তানের কোনো হাইকমিশনার পর্যন্ত ছিল না। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন পাকিস্তানি হাইকমিশনার রফিকুজ্জামান সিদ্দিকী দায়িত্ব পালন শেষে চলে যাওয়ার পর মার্চ মাসে ঢাকায় নতুন হাইকমিশনার হিসেবে সাকলাইন সাঈদের নাম ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হাইকমিশনার হিসেবে পাকিস্তানি এই কূটনীতিকের নিয়োগে অনুমোদন দেয়নি। দীর্ঘ দু'বছর হাইকমিশনার ছাড়া অবস্থায় ছিল ঢাকাস্থ পাকিস্তানের হাইকমিশন। দু' দেশের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দুই দেশ একে অপরকে ভিসা দেওয়াও বন্ধ করে দেয়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান নতুন করে ইমরান আহমেদ সিদ্দিকীকে বাংলাদেশে হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ করে। সরকারের ভিতরে থাকা পাকিস্তানি লবির জোর তৎপরতায় দ্রুত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়া যায় এবং জানুয়ারিতে তিনি ঢাকায় এসে পৌঁছান। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের কাছে তিনি তার পরিচয়পত্র পেশ করেন। অন্যদিকে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় সরকারের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে পাকিস্তানি হাইকমিশনারের তৎপরতা ছিল লক্ষণীয়। এরই অংশ হিসেবে গত পহেলা জুলাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকীর মন্তব্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদুলুকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধনে একসঙ্গে আবদ্ধ। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এই আকস্মিক সাক্ষাৎকারটির পেছনে সরকারের ভেতরের লবিটি জোরালো ভূমিকা পালন করেছে বলে জানা যায়। এই লবির তৎপরতায় গত জানুয়ারিতে নিরাপত্তার কারণে বিশ্বের সব দেশের বয়কট সত্ত্বেও বাংলাদেশের ক্রিকেট দল অদ্ভুত ৩ দফা সফরসূচি তৈরি করে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলিয়ে আনতেও তারা সক্ষম হয়, যদিও কোনো কোনো খেলোয়াড় নিরাপত্তার কারণ উল্লেখ করে পাকিস্তান সফরে যেতে রাজি হয়নি এবং করোনার কারণে বাকি দুটি সফর আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

কিন্তু বাংলাদেশ- পাকিস্তানের সুসম্পর্ক তৈরির চেষ্টায় ওই পাকিস্তানি গোষ্ঠীর সক্রিয়তা ও নানা উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।' ■

বলিউড ও ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ

ডাঃ আর এন দাস

ইংরেজি ফিল্মের নকল হিন্দি সিনেমা দেখে পয়সা নষ্ট করা ঠিক নয়। স্বাধীনতার পর দূরদৃষ্টিহীন নেহরু সনাতন ধর্মের দেশ থেকে হিন্দুত্বকে শেষ করার জন্য রাষ্ট্রবিরোধী নেতা ও কমিউনিস্টেদের সাহায্য নেন। ভয় ও লোভ দেখিয়ে খ্রিস্টানরা এবং বলিউড নামক লঘুজিহাদের মাধ্যমে ভারতে থাকা পাকিস্তানপ্রেমীরা হিন্দুর ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ধ্বংস করে চলেছে সাত দশক ধরে। কমিউনিস্টরা শিক্ষাক্ষেত্রগুলিকে আশ্রয় করে ভারতের ঐতিহ্য ও অতীত ইতিহাসকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত করেছে।

পেশীবহুল মুসলমান হিরো যেমন সাল্লুমিয়াঁ, আমীর ও শাহরুখ, সাইফ আলি, ফারহান আখতার ও নাওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি-সহ ৫০ জন বলিউডে কাজ করেন। পাকিস্তান থেকেও আবার শত্রুদেশে এসেছেন অনেকে। হিন্দু ললনারা হয়েছেন নিকা-করা-বিবি নয়তো ইন্ডাস্ট্রিতে গার্লফ্রেন্ড। আমীর খানের প্রথমা স্ত্রী রীনা দত্ত। স্বার্থসিদ্ধির পর তালাক দিয়ে দ্বিতীয় নিকা কিরণ রাওকে। 'বাপকা বেটা' সাইফ আলির প্রথমা বিবি অমৃতা ও দ্বিতীয়টি কারিনা কাপুর। পুত্রের নামটিও রেখেছেন নৃশংস হিন্দু হত্যাকারী তৈমুর লঙেরই নামে। শাহরুখের বিবি ব্রাহ্মণ কন্যা গৌরী। সাল্লুমিয়াঁর ভাই সোহেলের হিন্দুবিবি সীমা সচদেব হলে আরবাজের বিবি হলেন মালাইকা অরোরা। কট্টর মোদী-বিদ্বেষী নাসিরুদ্দিনের বিবি রত্না পাঠক ও সদ্যপ্রয়াত ইরফানের বিবি ছিলেন বাঙ্গালি হিন্দুকন্যা সুতপা শিকদার।

ধনী আরব শেঠরা বলিউডে টাকা খাটিয়ে, হিন্দু হিরোইন ভোগ করে, 'জিহাদে মদত' ও উপার্জিত টাকার সদ্ব্যবহার করে ভারতে ইসলামের প্রসার করে। 'রাম তেরী গঙ্গা মৈলি'র নায়িকা মন্দাকিনীর যৌনশোষণের কথা সবাই জানেন। ১৯৯৭ সালে 'ডি' কোম্পানির ভাড়াটে খুনি রসিদ আর রওফ 'টি' সিরিজের ভজন গায়ক ও প্রযোজক গুলশন কুমারকে নৃশংসভাবে খুন করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রযোজক নাদিম সারাভানের সুপারি পেয়ে। নাদিম লন্ডনে পালিয়ে যায় রাজনৈতিক অশ্রয় নিয়ে। এনসিপি-র নেতা ও আইনজীবী মাজিদ মেমন ছিলেন তাদের পক্ষের উকিল। কংগ্রেসের সাংসদ, কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র, জালিয়াতির আসামি বিজয় মাল্যও লন্ডনে এখন আশ্রয়প্রার্থী। মুম্বইয়ের তাজ হোটেলে ২৬/১১-র ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দাউদের ইশারায় হয়েছিল। সম্প্রতি এনসিপি-র নেতা প্রফুল্ল প্যাটেল ও কুখ্যাত আনিস ইব্রাহিম ও ইকবাল মির্চির নাম প্রকাশ পেয়েছে দাউদ ইব্রাহিমের সহযোগী হিসেবে। এসব দুষ্কৃতী রাজনেতাদের ছত্রছায়ায় থেকেই অপরাধ জগতের কাজকারবার সামলায়। ৫০-এর দশকে পেশোয়ারের ইউসুফ খানকে বলিউডে টাকা কামানোর জন্য দিলীপকুমার নাম নিতে হয়। সাংসদ হন কংগ্রেসের অনুগ্রহে। দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারও হাসিল করেন। খলনায়ক হামিদ আলি ওরফে অজিত, হিন্দুস্থান লিভারের কমেডিয়ান বদরুদ্দিন ওরফে 'জনি ওয়াকার' এবং সৈয়দ ইসতিয়াক আহমদ জাফরি ওরফে 'জগদীপ' চার দশক ধরে হিন্দুদের চোখে ধুলো দিয়ে পয়সা কামাতেন। একেই বলে 'আল তাকিয়া'। কাফেরদের ধোঁকা দেওয়ার পদ্ধতি। এখন সবাই ফেজটুপি পরে, ছাগল-দাড়ি রেখে, দম্ভের সঙ্গে হিন্দুদের বোকা বানিয়ে যোগ্য হিন্দু হিরোদের খেদিয়ে হিন্দু হিরোইনদের অঙ্কশায়িনী করে ইসলামের প্রচার প্রসার করে যাচ্ছে নির্বিচারে। সবাই এখন বুঝতে পেরেছে, বলিউড কীভাবে হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে এবং ইসলামকে মহিমান্বিত করছে। আহমেদাবাদ আইআইএম-এর অধ্যাপক ধীরাজ শর্মা তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, হিন্দি ফিল্মে স্ক্রিপট লেখক, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দিয়ে, বিশেষ গ্যাঙ্গের নির্দেশে বলিউড ইসলামিকরণের লঘুজিহাদ প্রক্রিয়া চালু রেখেছে। ওই গবেষক গত ছয় দশকে পঞ্চাশটি সিনেমা চয়ন ও বিশ্লেষণ করেছেন। 'এ থেকে জেড' পর্যন্ত নাম নিয়ে, পরিসংখ্যান সূত্র অনুযায়ী 'র‍্যান্ডোমাইজেশন' করে পক্ষপাতিত্বের ত্রুটি দূর করেছেন। প্রতিটি সিনেমাতে এটাই প্রতিপন্ন করা হয়েছে হিন্দু ও শিখরা পুরানোপন্থী এবং মুসলমানরা নবীনপন্থী।

আসলে উলটোটাই কিন্তু সত্যি। অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে ভেবেচিন্তে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের রাজনীতির সঙ্গে তালমিলিয়ে এক বিশেষ 'মত বা ইজমের' প্রবর্তনের জন্য সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। 'হিন্দু ও শিখ ধর্ম সবসময়ই অযৌক্তিক এবং ন্যায়বিরুদ্ধ, পক্ষান্তরে ইসলাম সর্বদাই ন্যায়পরায়ণ। হিন্দু-শিখদের অনেক দোষের মধ্যে 'কাউ, কারী ও কাস্টমে'র বিচ্যুতিই সবথেকে মারাত্মক। উঁচু-নীচু জাতিভেদ প্রথা যেন হিন্দু-শিখদের মজ্জাগত অসংশোধনীয় ত্রুটি কিন্তু মুসলমানরা সেসবের একেবারেই ঊর্ধ্বে।' এই প্রথম মনুসংহিতার সঠিক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ যেন বলিউডের কাহিনিকার ও সংলাপ রচয়িতারাই তাদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে আবিষ্কার করলেন। এগুলির জন্য চাই গভীর অধ্যয়ন ও সুনিয়োজিত পরিকল্পনা। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত দিল্লি, যাদবপুর, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বা অধ্যাপকরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে এগুলির গবেষণা করেন এবং বলিউডে বিক্রি করে অনেক উপরিলাভ করেন। অন্ধকার জগতের বাদশা হাজি মস্তান, রক্ত হিম করা দাউদ ইব্রাহিম, দুষ্কৃতী করিম লালা, ছোটা শাকিল ও আবু

সালেমরাই হলেন বলিউডের আসল মালিক ও চালক। নির্দেশক মহেশ ভাট নিজেই স্বীকার করেছেন— বলিউডের ছোটো-বড়ো সবাইকে মাফিয়াদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে হয়। 'হপ্তা দিতে হবে, নইলে প্রাণ'। ১৯৯৩ সালের মুম্বাইয়ের দাঙ্গার ষড়যন্ত্রে ধৃত ও আবু সালেমের সহযোগী সঞ্জয় দত্তকে পাঁচ বছর জেলের হাওয়া খেতে হয়। বলিউডের মনিকা বেদি ও আবু সালেম, সোনা ও হাজি মস্তান, হৃত্তিকের বাবা রাকেশ রোশনের আক্রমণকারী কুখ্যাত আলিবাবা বুঁদেশের কথা কে না জানে! প্রফেসর ধীরাজের গবেষণায় দেখানো হয়েছে, হিন্দি ফিল্মে পলিটিসিয়ানদের মধ্যে ৫৮ শতাংশই ব্রাহ্মণ হন। আগরওয়াল বা জৈন, ওইরকম জাতিবাচক শব্দের প্রয়োগে তার পেশা ও ধর্মবিশ্বাসের পরিচিতি দর্শক মনে মুদ্রিত করা হয়। হিন্দি সিনেমাতে ৬২ শতাংশ বৈশ্য ব্যবসায়ীরা অবশ্যই ভেজাল বা চোরাচালানের কারবারি হয়। হিন্দি সিনেমার ৭৪ শতাংশ শিখের ভূমিকাকে কমবুদ্ধিযুক্ত কমেডিয়ানের রোল দেওয়া হয়। বলিউডের সিনেমায় ধীরাজ শর্মা দেখিয়েছেন, ৭৮ শতাংশ ক্ষেত্রেই স্খলিত চরিত্রের মহিলার ভূমিকায় যারা কাজ করেছেন, তারা নামে ও পদবিতে খ্রিস্টান। ছাগলদাড়ি ও ফেজটুপি লাগিয়ে এক সাচ্চা, ইমানদার এবং আল্লার পাক্কা বান্দা মুসলমানের ভূমিকায় অভিনয় করছেন ইবাদত পাবার জন্য হিন্দু অভিনেতা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে বলছেন, 'একমাত্র আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর'!

সবথেকে আশ্চর্য লাগে যখন দেখা যায় পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কিছুদিনের পর থেকেই সিনেমা জগতের এই অপকীর্তি অপ্রতিহত গতিতে চলে আসছে। প্রফেসর শর্মা তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এর পিছনে আছে এক আন্তর্জাতিক চক্রান্ত যা প্রশাসনের পরোক্ষ সাহায্যে আজ এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সম্প্রতি, বলিউডে ৩৪ বছরের হিন্দু অভিনেতা সুশান্ত সিংহ রাজপুতের হত্যা অন্ধকার জগতের সঙ্গে সম্বন্ধিত বলেই অনুমান করা হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, 'বজরংগী ভাইজানে' কীভাবে 'বৈষম্যমূলক ও

বলিউড নায়ক অনিল কাপুরের সঙ্গে মুম্বাই বিস্ফোরণের অভিযুক্ত দাউদ ইব্রাহিম।

হিন্দি সিনেমার প্রখ্যাত অভিনেতা দিলীপ কুমারের পাশে মুম্বাইয়ের ডন হাজি মস্তান।

পুরানোপন্থী চিন্তাধারার' কথা ভারতীয় জনমানসে প্রতিফলিত হয়েছে। পাকিস্তানিরা মানে মুসলমানরা যেন হিন্দুদের তুলনায় কতো মহান ও মুক্তমনা। ভারতীয়রা আজ জানতে চাইছে, প্রতিনিয়ত এইভাবে হিন্দুদেরকে নীচ দেখানো, হিন্দু দেবদেবীর অবমাননা, হিন্দুমন্দির যেন মেয়ে-পটানোর নির্জনস্থান ইত্যাদির পিছনে কাদের হাত আছে? আজ যদি এই ষড়যন্ত্র সমূলে উৎপাটিত করা না হয়, তবে 'গাজওয়া-ই-হিন্দের' বিশাল চক্রান্ত সনাতন ধর্মের সঙ্গে শীঘ্রই সারাদেশকে গ্রাস করে ফেলবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে জনমানসের স্মৃতিতে অডিও-ভিসুয়ালের গভীর প্রভাবের কথা অনেক আগেই প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিদিন নাটক, থিয়েটার, টিভি, সিরিয়াল এবং সিনেমার চরিত্র এবং হিন্দুধর্মগ্রন্থের যেমন, রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্রকে বিকৃতরুচির সঙ্গে পরিবেশন করার বিষয়ে সাধ্বী ঋতম্ভরার উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'দেব কি দেব মহাদেব'-এ শিবচরিত্রে পার্বতীর প্রেমলীলা যেন মানবীয় প্রেমরসে অভিসিক্ত। হিন্দুনামধারী মুসলমান সিনেমা নির্দেশক এবং কামুক আলাউদ্দিন খিলজির চেয়েও নরাধম, সঞ্জয় বনসালীর 'পদ্মাবতী চরিত্র'টি রাজস্থানের মহান বীরাঙ্গনাদের চরিত্র শুধু ভূলুণ্ঠিত নয়, কলঙ্কিতও করেছে।

পাকিস্তানে দেখানো হয়েছে এমন বাছাই করা ২০টি হিন্দি ফিল্মের বিশ্লেষণে প্রফেসর ধীরাজ বলছেন, অন্ততপক্ষে ১৮টি ফিল্মে ভারতীয়দের তুলনায় পাকিস্তানিদের উদার, মুক্তমনা ও যুক্তিবাদী দেখানো হয়েছে। পাকিস্তানি মিলিটারি শাসক যে কট্টরপন্থী মতবাদের সমর্থক তাও দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে ভারত সরকারের আধিকারিকরা প্রায়শই ঘুষখোর ও ভ্রষ্টাচারী এবং জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেন বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিভেদমূলক আচরণ করেন।

কাহিনিকার তার গল্পের নায়ক-নায়িকাদের দিয়ে একটি 'ইজমের' প্রতি যেমন পক্ষপাতিত্ব করছেন, তেমনি অন্য একটিকে হীনভাবে জনমানসে প্রতিফলিত করছেন। হিন্দুদের টাকায় হিন্দুদেরই ধ্বংস করার অদ্ভুত এক রণনীতি! অভিনেতা নাসুরুদ্দিন শা, স্ক্রিপ্ট লেখক সেলিম কিংবা জাভেদ আখতার ও শাবানা আজমিদের জায়গা নিয়েছে এখনকার বলিউডের 'তিন খান' যারা সরাসরি পাকিস্তান ও ইসলামের প্রতি সমর্থন এবং হিন্দুবিরোধী অ্যাজেন্ডা চালিয়ে যাচ্ছেন।

একজন গবেষক হিন্দি ফিল্মের কিছু অংশ দেখিয়ে ১৫০ জন ছাত্রের উপর এক সমীক্ষা চালান। তাতে দেখা যায় ৯৪ শতাংশ ছাত্রই সিনেমাতে দেখানো কল্পকাহিনিকে সত্য বলে মনে করেছে। বলিউডের হিন্দু নায়িকার নগ্ননাচ ও পেশীযুক্ত মুসলমান নায়কদের রোমহর্ষক 'অ্যাকশন ফিল্ম' পাকিস্তান-সহ আরবদেশ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং ইউরোপের মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয়।

আজ সারাবিশ্ব ইসলামি তাণ্ডব সম্পর্কে কম-বেশি ওয়াকিবহাল। বিশ্বের সর্বত্র মুসলমান মানেই দাঙ্গাবাজ, দুষ্কৃতী, 'কাফেরদের হত্যা ও বলাৎকারী'। ইসলামের এই কুৎসিত ও মলিন ছবিকে শুদ্ধ ও পবিত্র করার দায়িত্ব যেন দেওয়া হয়েছে বলিউডের তারকাদের। উলটে বলিউডে দেখানো হচ্ছে ভারতের হিন্দুরাই সন্ত্রাসবাদী এবং সংখ্যালঘু মুসলমানরা সন্ত্রাসপীড়িত। উর্দু সংবাদপত্র 'সাহারা'-র সম্পাদক আজিজ বার্নির লেখা 'আরএসএস কি সাজিস' নামক বইটির উদ্ঘাটন করে কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংহ ১৯৯৩ সালে বোম্বে-দাঙ্গা ও তাজ হোটেলের অগ্নিসংযোগে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের' দায়ী করেন। শাহরুখের সিনেমা 'ম্যায় হুনা'তে সন্ত্রাসবাদী দলের সর্দারের নাম রাখা হয় এক হিন্দুর। শিল্পী হিসেবে সুনীল শেট্টিকে নামানো হয়।

বলিউডের দুই জিহাদি জাভেদ আখতার ও সেলিম খান। হিন্দুদের হীন দেখানোর জন্য ব্রাহ্মণকে মিথ্যাবাদী ও পাখণ্ডী, পুরোহিতকে ঠগ ও বাটপাড়, বৈশ্যকে সুদখোর ও ভেজালদার এবং শিখকে মূর্খ ও হাসিরপাত্র কমেডিয়ানের রোলে দেখানো হয়। ৮০ শতাংশ হিন্দু গ্যাঁটের টাকা খরচ করে ৩ ঘণ্টা ধরে সেইসব বিষ গিলে হিন্দুবিরোধী হয়ে উঠেন। ধর্মেন্দ্র 'শোলে' সিনেমাতে হেমামালিনীকে শিবমন্দিরে প্রেমজালে ফাঁসাচ্ছেন। অন্যদিকে এ.কে. হাঙ্গলের মতো হিন্দু নেকি মুসলমানের রোল করছেন। ধর্মপ্রাণ রহিম চাচা ছেলে আহমদের শবযাত্রায় গেলেন না কিন্তু আল্লার ইবাদতের জন্য নামাজকেই প্রাধান্য দিলেন। দীবার ফিল্মে পকেটে রাখা '৭৮৬' লেখা পিতলের তকমা বিল্লা ওরফে অমিতাভকে বিপদমুক্ত করে। 'জঞ্জির' ফিল্মে অমিতাভ নাস্তিক এবং ঈশ্বরে আস্থাহীন জয়া হতাশাজনক গান গাইছেন। কিন্তু 'শের খান' হয়েছেন এক নেকি মুসলমান। হিন্দি ফিল্মে 'শান' -এ অমিতাভ ও শশীকাপুর সাধুর বেশে ভক্তদের ঠকাচ্ছেন অথচ আব্দুল এমনই এক নেকি মুসলমান যে সত্য রক্ষার জন্য নির্দ্বিধায় প্রাণবিসর্জন দিচ্ছেন! 'ক্রান্তি' সিনেমাতে শেরওয়ালির পূজারি রাজা প্রদীপকুমার একজন দেশদ্রোহী। অন্যদিকে করিম খান একজন মহান দেশভক্ত যিনি দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিচ্ছেন।

পাকিস্তানের সৃষ্টি নাকি হিন্দুরাই করেছিল ১৯৪৭ সালে। মমতা বলেন, হিন্দু মানে ত্যাগ, শিখ মানেই আত্মবলিদান, মুসলমান মানে ইমান আর ইশাই মানেই সেবা। আহারে, কী ক্ষুরধার বুদ্ধি! 'অমর-আকবর-অ্যান্টনি'র তিন শিশুর পিতা কিশনলাল একজন খুনি ও চোরাকারবারি। কিন্তু আকবর ও অ্যান্টনির পালনকর্তা দরিদ্র দর্জি মুসলমান এবং ইশাইটি মহান! ভারতীকে বাঁচিয়ে দর্জিটি মহত্তর হয়েছেন। সেলিম-জাভেদদের সিনেমাতে নাস্তিক অথবা ভগবানকে উপহাসকারী হবে হিন্দু কিন্তু একজন মুসলমান শের খান পাঠান বা আব্দুল, ডিএসপি ডিস্যুজা, পাদরি মাইকেল ও ডেভিডের মতো আদর্শ চরিত্রগুলি শুধুই খ্রিস্টান ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের জন্য একচিটিয়া থাকবে। কাদের খান, কায়েফি আজমি ও কাশ্মীরি মহেশ ভাটও সেকুলারপন্থী হিন্দুবিদ্বেষী। বলিউডের তিন খানের মধ্যে 'সত্যমেব জয়তে'র পরিচালক আমীরখান হচ্ছেন ধূর্ত চূড়ামণি এবং ভয়ংকর হিন্দুবিদ্বেষী। 'পিকে' সিনেমাতে আল্লাকে বাঁচিয়ে রেখে, হিন্দুদেবতাদের খতম করেছেন! বজরংবলীর মূর্তিহীন কুস্তি-আধারিত ফিল্ম 'দঙ্গল'-এ দেখানো হয়েছে জয়ের জন্য, হিন্দু কুস্তিগিরকে মাংস ও কসাইয়ের দেওয়া প্রসাদ খেতেই হবে। সাল্লুমিঁয়ার 'বজরঙ্গী ভাইজান'-এ পাকিস্তানিকে মুক্তমনা ও ভারতীয়কে পুরানাপন্থী দেখিয়েছেন। মমতার ব্রান্ড অ্যাম্বাসাডার শাহরুখ খানের, 'মাই নেম ইজ খান'-এ তিনি স্পষ্টই ইসলামি জিহাদের ডাক দিয়েছেন।

হলিউডের সিনেমাগুলি খ্রিস্টধর্মকে আঘাত দেবার সাহাস দেখায় না, বরং ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারকবাহক হিসেবে কাজ করে। ভারতে উলটো হয়। শাহরুখের কথায়, ভারতীয় ইতিহাসের শুরু নাকি মুঘল সাম্রাজ্য থেকে, তাই সংস্কৃতিটাও ইসলামি। সেজন্য আজও ভারতে ৮০ শতাংশ হিন্দুরা বেঁচে আছে ইসলামের শান্তিদূতদের কৃপায়। হিন্দু সংস্কৃতি বা সভ্যতার সঙ্গে বলিউডের কোনো সম্পর্ক নেই। পাকিস্তানি গজলের 'রাব্বা ও মৌলা'-র কাছে 'হিন্দুর ভজন' নীরস ও নিরর্থক।

সংগীতকার সনু নিগম, অভিজিৎ বাপ্পি লাহিড়ীর নাম এরাই মিটিয়ে দিয়েছে। সুর, সংগীত ও বাদ্যে মুসলমানদের যেন একচেটিয়া অধিকার। তাই আসুন শপথ করি, সংবদ্ধ হয়ে বলিউডের বিরোধিতা করি।■

ভারতের নিজস্ব গুগুল, ফেসবুক সম্ভাবনা নাকি মরীচিকা

জ্যোতিপ্রকাশ চ্যাটার্জি

আমাদের অনেকের মনে হতে পারে ভারতের নিজস্ব গুগুল, ফেসবুকের প্রয়োজন কেন? আমরা তো এগুলো বিনামূল্যে ব্যবহার করি। এখন নতুন করে অর্থ ব্যয় করার কী দরকার। উত্তরের জন্য কিছু বিষয় বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

একবিংশ শতাব্দী হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শতাব্দী। যেসব দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাবে তারাই হবে আগামী বিশ্বের পরাশক্তি। অধুনা বিজ্ঞানীরা বলেন 'Data is the new Oil'। তাহলে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভারত কীভাবে নতুন তেলকে ব্যবহার করবে সেটার উপর নির্ভর করবে বিশ্ব-রাজনীতিতে ভারতের অবস্থান কোথায় থাকবে। ২০০৬ থেকে ২০১৬ সালের

মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলো যেভাবে প্রথম সারিতে চলে এসেছে নীচের তথ্য থেকে স্পষ্ট।

২০০৬ (শীর্ষ কোম্পানি)	২০১৬ (শীর্ষ কোম্পানি)
এস ও মোবাইল (প্রযুক্তি)	অ্যাপেন (প্রযুক্তি)
জেনারেল ইলেকট্রিক (বিদ্যুৎ)	অ্যালফাবেট (প্রযুক্তি)
গ্যাস প্রন (গ্যাস)	মাইক্রোসফট (প্রযুক্তি)
মাইক্রোসফট (প্রযুক্তি)	বক্সসার
সিটি ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্ক)	আমাজন (প্রযুক্তি)
ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম (তেল ও গ্যাস)	ফেসবুক (প্রযুক্তি)
পেট্রো চায়না (তেল ও গ্যাস)	চায়না মোবাইল (প্রযুক্তি)
এইচ এম বি সি (ব্যাঙ্ক)	

আগামী বিশ্বে তথ্য ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলি বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

এবার আসল প্রশ্নের উত্তরে আসা যাক। আমাদের কারগিল যুদ্ধের কথা মনে আছে। মনে হতে পারে তথ্য ও প্রযুক্তির সঙ্গে কারগিল যুদ্ধের কী সম্পর্ক। হ্যাঁ ঠিকই শুনছেন, ১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধের সময় ভারত যখন পাকিস্তানের জঙ্গি ও সেনাবাহিনীর উপযুক্ত অবস্থান জানার জন্য আমেরিকার কাছে জিপিএস স্যাটেলাইট-এর তথ্য চেয়েছিল তখন আমেরিকা ভারতকে তথ্য দিতে অস্বীকার করে। যার ফলস্বরূপ ভারত নিজস্ব ও স্বতন্ত্রভাবে ৭টি স্যাটেলাইট যুক্তIRNSS তৈরি করে। যার ফলে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ভারতের নজরে চলে আসে। ব্রহ্মস মিসাইল ৩০০ কিলোগ্রাম বোমা বহনে সক্ষম। এটা স্পষ্ট যে ভারতীয়দের মেধা কোনো অংশে কম নয়, প্রয়োজন শুধু মানসিকতা। যেসব কারণে তথ্যপ্রযুক্তিতে ভারতকে স্বয়ংসম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো—

(ক) গুগুল, ফেসবুক-সহ অন্যান্য বিদেশি তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলি ভারত থেকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করে। যেহেতু তাদের কাছে ভারতের বাজার হচ্ছে ১৪০ কোটি মানুষের বাজার, সেজন্য সবার লক্ষ্য থাকে ভারতের এই বাজারকে কবজা করা।

(খ) এই কোম্পানিগুলি হচ্ছে তথ্যভিত্তিক কোম্পানি। যেহেতু তথ্য(Data) এই সমস্ত বিদেশি কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেইজন্য তারা জনমতামতের উপর প্রভাব তৈরি করতে পারে যেটা ভারতের সার্বভৌমত্বের অত্যন্ত ক্ষতিকর।

(গ) তারা জাতীয় বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফেসবুককে ব্যবহার করে

কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা নামে কোম্পানির ২০১৬ সালের আমেরিকার নির্বাচনে তথ্যের অপব্যবহার করা।

(ঘ) ভারতে গুগুল-সহ অন্যান্য বিদেশি কোম্পানিগুলির ব্যবসা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কোম্পানিগুলির বাজার মূলধন কমতে শুরু করেছে।

অবাক হতে হয়, বিশ্বের প্রথম তিনটি কোম্পানি মাইক্রোসফট, আমাজন, আপেল-এর মোট বাজার মূলধন ভারতের মোট জিডিপি-র থেকে বেশি। এই কোম্পানিগুলির বাজার মূলধনে বড়ো অংশ ভারত থেকে আসে। এরা চীন থেকে সুবিধা করতে না পেরে ভারতকে তাদের ব্যবসায়িক এলাকায় পরিণত করতে শুরু করে। চীন সেন্সরের অজুহাত দেখিয়ে গুগুলকে বের কবে দেয়, জায়গা করে নেয় চীনা কোম্পানি বাইডু। চীনা কোম্পানি আলিবাবার কাছে আমাজোনের মতো কোম্পানিকে ধরাশায়ী হতে হয়। উবের চীনা কোম্পানি দিদি চুজিংয়ের কাছে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে ভারতে ঘাঁটি তৈরি করে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো চীনা কোম্পানি আলিবাবা, টেনসেন্ট-এর মতো কোম্পানি বিশ্বের প্রথম দশটি কোম্পানির মধ্য উঠে আসা। আলিবাবা, টেনসেন্টও ভারতের বাজারকে দখল করতে মরিয়া। চীনের মতো সর্বগ্রাসী দেশের কাছে আমাদের দেশের জনগণের তথ্য চলে যাওয়া কতটা বিপজ্জনক সেটা পরিষ্কার। চীন Artificial intelligence (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা), কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ডিপ লার্নিং, মেশিন লার্নিং-এর মতো নতুন প্রযুক্তিতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ শুরু করেছে বিগত কয়েক বছরে। এই সমস্ত প্রযুক্তির মূল আধার হচ্ছে তথ্য বা Data। চীনের কাছে এই তথ্য চলে যাওয়ার অর্থ হলো ওরা এইসমস্ত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ভারতের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কারা এগিয়ে আসবে ভারতের নিজস্ব গুগুল, ফেসবুক তৈরি করতে ,ভারতীয় কোম্পানি না ভারত সরকার? ভারতের তিনটি প্রধান কোম্পানি টিসিএস, উপপ্রো এবং ইনফোসিসের বাজার মূলধন মাইক্রোসফটের বাজার মূলধনের থেকে কম। এর কারণ হলো ভারতের কোম্পানিগুলি ঝুঁকি নিতে আগ্রহী নয়। তারা নতুন প্রযুক্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে চায় না। এ রকম চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের কোম্পানিগুলির বাজার মূলধন তলানিতে গিয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং এই কাজের জন্য ভারত সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। যে কাজে মোদী সরকার অনেকাংশেই সফল। মূলত পাঁচটি বাজারকে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে বাজারগুলি দখল করতে পারলে আগামী দশবছরের মধ্য ভারত বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হওয়ার দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাবে সেগুলো হলো—

(ক) সামাজিক নেটওয়ার্কিং যেমন— ফেসবুকের মতো ভারতীয় নিজস্ব সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট তৈরি করা।

(খ) বৈশ্বিক নাগাল পেতে গুগুলের মতো ভারতীয় সার্চ ইঞ্জিন তৈরি করা।

(গ) অনলাইন ব্যবসা ও বাণিজ্যের জন্য আমাজন, আলিবাবার মতোই কোম্পানি তৈরি করা।

(ঘ) মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার-এর মতো ভারতীয় মাইক্রোব্লগিং সাইট তৈরি করা।

উপরের বাজারগুলিকে লক্ষ্য করে যদি কাজ করা যায় তাহলে চাকরি সৃষ্টি থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পরাশক্তির দিকে ভারতকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, ভারত ক্রেতাভিত্তিক বাজার থেকে মালিকানা-কেন্দ্রিক বাজারে পরিণত হবে।

এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি নরেন্দ্র মোদীর মতো একজন শক্তিশালী ও দেশপ্রেমী নেতৃত্বের পক্ষেই সম্ভব যিনি ভারতকে বিশ্বগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। এস্তোনিয়ার মতো ছোটো দেশ যদি সাইবার নিরাপত্তায় বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হতে পারে তাহলে মেধাসমৃদ্ধ ভারত তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্ব-শক্তি হতে পারবে না কেন? ▮

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

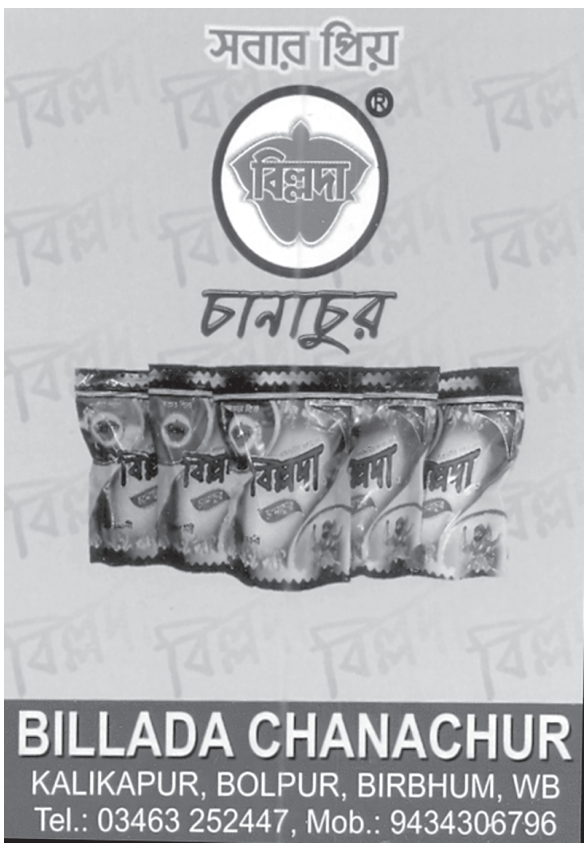

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরিবর্তনের অনুভব

বলরাম দাসরায়

অসম তথা উত্তরপূর্বাঞ্চলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার কর্মযজ্ঞের সাধনা ৭০ বছর পার করেছে। সেখানে আমি ৩০ বছর সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করি। শেষ কয়েকটি বছরের উত্তরপূর্বাঞ্চলের কিছু বিষয় সবার সঙ্গে শেয়ার করতে চাইছি। আমরা বিশ্বাস কবি — সঙ্ঘকাজ ঈশ্বরীয় কাজ । সেখানে সঙ্ঘকর্মযজ্ঞে স্বয়ংসেবকদের পরিশ্রম ও আত্মবলিদানের ফলস্বরূপ সমাজজীবনে জনতা জনার্দন এক বিরাট পরিবর্তন আনছে, তার আভাস আমরা কয়েকবছর থেকে উত্তরপূর্বাঞ্চলে বসেই অনুমান করছিলাম।

স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থা উঠে যাবার পর কোচবিহার জেলায় প্রবাসে এসেছিলেন। নগরের স্বয়ংসেবক সম্মেলনে বৌদ্ধিকে বলেছিলেন, '১৮ মাসের স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচার শেষ হয়েছে। ভারতের জনতা জনার্দন অশুভ শক্তিকে অপসারিত করে শুভ শক্তিকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। জনতা যখন জাগ্রত ও সক্রিয় হয় তখন দেশে অনেক 'পরিবর্তন'ও আসে। অনেক আগে থেকে তার শুভ ইঙ্গিত অনুভব হয়। যাঁরা অনুভব করার, ঠিক অনুভব করেন এবং সাধারণ মানুষকে পথনির্দেশও করে থাকেন।'

আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসছেন, অসম, ত্রিপুরা, অরুণাচল, মণিপুরেও সেভাবে জাগ্রত হিন্দুসমাজ সক্রিয়তা ও সংগঠিত রূপ দেখিয়েছিল। ১৯৮৮ সালে জেলা প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে ত্রিপুরা গিয়েছিলাম। সেখানে সব রাজ্যেই এক হতাসার পরিবেশ বিরাজ করছিল। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্বে থাকাকালীন শুনেছিলাম অসমে হিন্দু সংগঠনের কাজ বৃদ্ধি না হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতে যুক্ত রাখা সম্ভব হবে না। কারণ তখন অসম ছিল 'হার্ড নাট টু ক্র্যাক' । তৎকালীন অসম-বঙ্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারক সুদর্শনজী সারাভারত ভ্রমণ করে স্বয়ংসেবক ও নাগরিকদের সামনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানচিত্র রেখে সেখানকার পরিস্থিতি বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতের রাজ্যে রাজ্যে সুদর্শনজী অসমের প্রান্তের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছিলেন।

সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বাঁচাতে সেখানকার সাতটি রাজ্যকে সাংগঠনিক দৃষ্টিতে শক্তিশালী রাজ্যগুলি দত্তক নেবে। ধনবল, জনবল ও বুদ্ধিবল দ্বারা সেখানকার কাজে সহযোগিতা করবে। ত্রিপুরার দায়িত্ব পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গের ওপর। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে অনেক প্রচারক ও পূর্ণকালীন কার্যকর্তাকে সেখানকার বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়। ১৯৮৮ সালে আমি যখন প্রথম ত্রিপুরাতে যাই, তখন প্রথম বামফ্রন্ট শাসনের শেষ প্রহর চলছিল। সামনেই ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচন ছিল। শহরে ও গ্রামে আওয়াজ উঠেছিল 'লালের তলে যাইও না, পোলা হারা হইও না'। নির্বাচনে বামফ্রন্টকে পরাজিত করে জোট-সরকার ক্ষমতায় এসেছিল।

সেখানকার সব রাজ্যেই অরাজকতা চলছিল। সেখান থেকে একের পর এক প্রাণ বলিদানের সংবাদ আসছিল। ভারতমাতার নামে সংকল্পবদ্ধ সন্তানস্বরূপ স্বয়ংসেবক-সেনানীরা মাতৃচরণে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করছিল। ১৯৯০ সালে নলবাড়ী জেলা প্রচারক মুরলীজীকে অসমের জঙ্গলে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে প্রাণাহুতি দিতে হয়েছিল। কারণ উলফা সদস্যরা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজরাজ্য কেরলে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল। মুরলীজী সেই নির্দেশ পালন করেননি বলে এই শাস্তি পেতে হয়েছিল। একবছর পর ধুবড়ী বিভাগের কোকরাঝার জেলা প্রচারক মির্জাপুরের (U.P.) ওমপ্রকাশ চতুর্বেদী ও বরপেটার জেলা প্রচারক মহারাষ্ট্র হতে আগত প্রমোদ দীক্ষিতজীকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাগুলো সংগঠিত হওয়ার জন্য লোয়ার অসমের নলবাড়ী ও ধুবড়ী বিভাগে সঙ্ঘকাজের গতি আলফা-আতংকে মন্থর হয়ে যায়। সেই সময় আমাকে ধুবড়ী বিভাগ প্রচারক হিসেবে ত্রিপুরা থেকে স্থানান্তরিত করা হয়। কয়েকজন গৃহী কার্যকর্তাকেও মাতৃচরণে প্রাণাহুতি দিতে হয়েছে। মণিপুরের স্বয়ংসেবক মধুমঙ্গল শর্মা, আগরতলার স্বয়ংসেবক শ্যামহরি শর্মা, কল্যাণ আশ্রমের কোকরাঝাড় জেলার রতন বোড়ো, নলবাড়ী বিভাগ কার্যবাহ শুক্লেশ্বর মেধী। পশ্চিমবঙ্গ হতে যাঁরা ত্রিপুরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্যামল সেনগুপ্ত, যিনি গৃহস্থ কার্যকর্তা হয়েও প্রচারকের মতো প্রবাস করতেন। শ্যামলদা, সুধাময় দত্ত, দীনেন্দ্র নাথ দে ও শুভঙ্কর (কাঞ্চন) চক্রবর্তী ত্রিপুরাতে বাম জামানায় ১৯৯৯ সালে প্রবাসে গিয়েছিলেন। এলএলএফটি সন্ত্রাসবাদীরা খ্রিস্টান মিশনারিদের নির্দেশে তাঁদের অপহরণ করে ত্রিপুরার জঙ্গলে হত্যা করে। এই সংবাদ তৎকালীন সরকার্যবাহ মোহনরাও ভাগবতজী গৌহাটীতে ২০০১ সালের ২৮ জুলাই আমাদের প্রদেশিক বৈঠকে সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলেন। ওই মৃত্যুসংবাদ কতটা বেদনাদায়ক ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বেদনাদায়ক মুহূর্তে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছিলাম। কারণ এই চিন্তাভাবনা বা সংকল্প নিয়েই আমরা ডাক্তারজীর স্বপ্ন সাকার করতে চলেছি। একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি মনে পড়ছে—

''আপন হৃদয়, নিঙারিয়া মোরা শোনিত করেছি দান।
বিশ্বের মাঝে রেখে যেতে চাই জননীর সম্মান।''

আমার প্রতি নির্দেশ আসে, আমাকে দক্ষিণ অসম প্রান্তের শিলচরে যেতে হবে। ত্রিপুরা তখন দক্ষিণ অসম প্রান্তের সঙ্গে ছিল। চারজন কার্যকর্তার মৃত্যুর জন্য অনেক স্বয়ংসেবকের বাড়িতে বিরোধিতা হচ্ছিল। কার্যকর্তাদের বৈঠক বোঝানো হচ্ছিল যে, আতঙ্কের পরিবেশ ও বিরোধিতা শীঘ্রই অবসান হবে। কারণ শত শত কার্যকর্তা তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ে, জঙ্গলের গ্রামে ও চা বাগানের বস্তিতে ভারতমায়ের সেবার জন্য দৃঢ়সংকল্প নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। দৃঢ়সংকল্পের বাক্যগুলো যে আমাদের সবসময় বাধাবিপত্তির মাঝেও কাজ করার প্রেরণা দেয়। সংকল্পে আমরা বলেছি—'সঙ্ঘের কাজ সৎ ভাবে, নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে দেহ, মন ও ধন দ্বারা করিব'।

উত্তর -পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য সঙ্ঘ অধিকারীদের সংকল্পবদ্ধ হবার আহ্বান এবং অধিকারীদের পথপ্রদর্শন দ্বারা সেখানকার ভয়ংকর পরিবেশের চিত্র বদল হতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যগুলিতে কল্যাণ আশ্রম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সেবা ভারতীর দ্বারা সেবাকাজ ক্রমশ বিস্তার লাভ করছিল। বনবন্ধু পরিষদ ও বিদ্যাভারতী দ্বারা শ্রীরাম কথা ও শ্রীকৃষ্ণ কথার কার্যক্রম, একল বিদ্যালয় যোজনা, চা-বাগান অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে, বস্তিতে বস্তিতে এক একটি শক্তিকেন্দ্র স্থাপন হয়ে গিয়েছিল। এই কাজে বিস্তারলাভের জন্য রাষ্ট্র বিরোধী শক্তির ক্রিয়াকলাপও বন্ধ হতে শুরু হয়ে যায়। কারণ খ্রিস্টান মিশনারিদের সামনে আমাদের এই কাজ বা সংগঠন পালটা ধমকি স্বরূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সাধারণ জনতাও এই রাষ্ট্র বিরোধী কাজের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসছিল। জনতা জনার্দন প্রতিটি রাজ্যে এই পরিস্থিতিতে জাগ্রত নাগরিকের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হচ্ছে—সেটা অনুভব হচ্ছিল।

ত্রিপুরা রাজ্যেও গত ৪০-৪৫ বছর যাবৎ যেসব ঘটনা ঘটে চলেছিল, তার প্রতিক্রিয়া জাগ্রত জনতার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। পূজ্য শান্তিকালী মহারাজের হত্যাকাণ্ড, শ্যামহরি শর্মার হত্যা , সঙ্ঘের চার কার্যকর্তার হত্যা এবং হিন্দু শ্রদ্ধাবিন্দুর উপর খ্রিস্টান মিশনারিদের মদতে ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদীদের একের পর এক আঘাতের ঘটনা ঘটে চলেছিল। সাধারণ জনতা এই পরিবেশ পরিবর্তনের পথ খুঁজছিল। ত্রিপুরা রাজ্যেও কল্যাণ আশ্রম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সেবা ভারতী, একল অভিযান, বাঁশওয়ারা পরিযোজনা, শিবরাঈ সংগঠন এবং অন্য আরও কয়েকটি সংগঠন দ্বারা সমাজ জাগরণের যে কর্মযজ্ঞ চলছিল, তার পরিণাম আসতে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আগরতলাতে ২০১৭ সালে সরসঙ্ঘচালকজীর প্রবাস উপলক্ষ্যে স্বয়ংসেবক ও নাগরিকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নাম দেওয়া হয়েছিল 'হিন্দু মালায়ামা'। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েত হতে যথেষ্ট সংখ্যায় স্বয়ংসেবক ও নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব হয়েছিল। সম্মেলনের পূর্বে প্রত্যেক নগর, গ্রাম ও পাহাড়িক্ষেত্রে 'জয়শ্রীরাম' লেখা গৈরিক পতাকা লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। নাগরিকরা নিজ আগ্রহে গৈরিক পতাকা লাগিয়ে তাঁদের গ্রামগুলো গেরুয়াময় করেছিল। যে ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিকরা লালঝান্ডা ছাড়া অন্য পতাকা দেখতে অভ্যস্ত ছিল না, সে রাজ্যের জনতা এই কার্যক্রম দ্বারা অশুভ শক্তির হাত থেকে নিজেদেরকে মুক্তি পেতে চাইছিল।

ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের চারজন কার্যকর্তার জীবনদানের প্রতিদান স্বরূপ পট পরিবর্তন আগত প্রায়। যেভাবে হিন্দুসমাজ খ্রিস্টান মিশনারিদের পাঁতা ফাঁদ হতে সামাজিক মুক্তি চাইছিল এবং মনে হচ্ছিল রাজনৈতিক লাভালাভকে প্রশ্রয়দানের চক্রান্ত হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই এই পরিবেশ নির্মাণ হয়েছিল। ত্রিপুরা ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি রাজ্য। তার পরিবর্তন না হলে বৈভবশালী ভারতের পুনর্নির্মাণ কী করে সম্ভব হবে। কাজ অনেক বাকি, অশুভ শক্তি আজও সক্রিয় রয়েছে।
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আগত অন্যান্য রাজ্যের স্বয়ংসেবকরা ও স্থানীয় শুভশক্তি যেমন সংকল্পবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যেও সেখানকার স্বয়ংসেবকরা প্রতি বছর ৬ আগস্টে নুতন করে সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলার পাথেয় সংগ্রহ করে থাকে।

তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর সময় হতে আজ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি পরিবর্তনের যে প্রচেষ্টা হয়েছে, সেই বিষয়গুলি আগামী প্রজন্মের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারত তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভারতমাতার এই কর্মযজ্ঞের যদি কোনো ইতিহাস লেখা হয়, তাহলে সমাজ জাগরণ ও সমাজ সংগঠনের সময়কালের প্রতিটি 'টার্নিপয়েন্ট' শিক্ষণীয় হবে। প্রতি মুহূর্তে বাধা এসেছে এবং স্বয়ংসেবকরা সেই সকল বাধা নিজেদের জীবন বাজি রেখে এগিয়ে গেছে। কারণ স্বয়ংসেবকদের মন্ত্র হলো—
''যায় যেন ভাই জীবন মোদের এই মাটিকেই ভালবেসে
মায়ের সেবা করব শুধু মায়ের কোলেই ফিরে এসে।।''

অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি 'টার্নিংপয়েন্ট' আমাদের প্রেরণা দিয়ে যাবে। কারণ আমরা বর্তমান সময়ের ভারতমায়ের জাগ্রত প্রহরী — 'বয়ং হিন্দুরাষ্ট্রে জাগৃয়াম।'

(প্রতিবেদক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ)

With Best Compliments
From -

A
Well Wisher

ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ঘটল

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীর দু'হাজার বছরের ইতিহাসে বর্তমান ২০২০ সালটা বৃহত্তম মহামারীর কাল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকবে। গুটিকয় হাতে গোনা দেশ ছাড়া এমন কোনো দেশ নেই যারা এই অদৃশ্য মারণ ভাইরাসের সংক্রমণজনিত আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়নি। মহাকালের বিচারে এই বছরটা যেন ইট চাপা ঘাসের মতো থেকে যাবে।

এই ঘটনার বাইরে এই বছরের যে দুটি ঘটনা ইতিমধ্যেই বিশেষ স্থান করে নিয়েছে সেগুলি হল তুরস্ক ও ভারতবর্ষে দুটি ধর্মস্থানের নবকলেবর যাত্রার পত্তন। দুই ক্ষেত্রেই ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ঘটল। একটি গোড়ায় যা ছিল না তাই হতে চলেছে, অন্যটি ফিরবে আদির টানে। সেই সঙ্গে বর্তমান কাঠামোর ভক্তদের ভক্তিভরে নবদেবালয় বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এখানে রয়েছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ভূমিকা।

৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে বাইজান্টাইন শাসনকালে নির্মিত বিস্ময়কর স্থাপত্যকীর্তির গির্জা 'আয়া সোফিয়া' ১৪৫৩ তে অটোমান রোমান শাসনকালে 'হাজিয়া সোফিয়া' মসজিদে রূপান্তরিত হয়, যেটি বিশ্বের আপামর পর্যটকদের কাছে ব্লু মস্ক নামে পরিচিত। ভ্রমণকারীদের কাছে যার হাতছানি প্রায় তাজমহলের মতোই অপ্রতিরোধ্য। আরও পরে ১৯৩৫-এ কামাল আতাতুর্ক পাশার হাতে ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটি মিউজিয়ামে পরিণত হয়। সযত্নে যথাসম্ভব রক্ষিত থাকে খ্রিস্টীয় ও ইসলামি স্থাপত্যের অমূল্য নিদর্শনগুলি।

কিন্তু তুরস্কের বর্তমান শাসক এদগোয়ার্নোর গোঁয়ারতুমিতে ১০ জুলাই, ২০২০ সেখানকার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় জানালো, সেকুলার মিউজিয়ামকে ইসলামিক উপাসনাগার হতে হবে। প্রার্থনাকালে ঢাকা থাকবে অনিন্দ্যসুন্দর মেরি যিশুর অবয়ব-সহ নবম শতকের বহুমূল্য মাস্টারপিসগুলিও। সেই সময় বিধর্মীদের জন্য বন্ধ হবে দরজা। তুরস্কের বর্তমান শাসক প্রমাণ করলেন কামাল পাশা নামক প্রহ্লাদের দৈত্যকুলে কোনো স্থান নেই। একদিন 'সেকুলার' ভারতবর্ষে স্যাটানিক ভার্সেস নিষিদ্ধ হলেও তুরস্কে নিষিদ্ধ হয়নি। ভাবা যেতেই পারে আগামীদিনে তুরস্কও 'সেকুলার' ভারতের পথে হেঁটে রুশদির কিতাব নিষিদ্ধ করবে।

সেনজেন ভিসার মেয়াদকাল এখনো বজায় থাকার কারণে ইজরায়েল ভিসা পাওয়া অনেক সহজ ও সুলভ। তাই সেই সঙ্গে কায়রো আর ইস্তাম্বুলকেও জুড়েছিলাম। বসফরাসে ভাসা, সেই সঙ্গে ব্লু মস্ককে দুচোখ ভরে দেখার সাধ দীর্ঘ দিনের। সেই সঙ্গে সোক আরাবিকের পথে জেরুজালেমে হাঁটব, নীল নদের ক্রুজ সেরে চাঁদের আলোয় স্ফিংস দেখব। এই সব ভাবনায় জল ঢেলে দিল দুই ভাইরাস : করোনা আর এদগোয়ার্নো। আয়া শোফিয়ার শীলিত দেহের অমূল্য সৌন্দর্যায়ন ঢেকে বসানো হয়েছিল ইসলামের অলংকার। পুনর্মসজিদিকরণের পক্ষে উদ্ধত সওয়াল হতেই পারে। স্পেনে যখন মসজিদ ভেঙেছিল তার বেলায়?

একথা ঠিক, ১৩৩৪-এর পর সার্বিয়া, বোসনিয়া, আলবানিয়া, এপিরাস, এশিয়া মাইনর— এগুলোকে ওটোমান সাম্রাজ্য একত্রিত করছিল। বেলগ্রেড ছুঁই ছুঁই। হাঙ্গেরি, ভিয়েনা, মাল্টা দখল কেবল সময়ের অপেক্ষা। ঠিক তখনই ক্যাথলিক পর্তুগাল এবং সঙ্গী এসপানিয়া রুদ্র রূপ ধারণ করেছিল। পোপ পঞ্চম নিকোলাস মন্তব্য করেছিলেন, 'The war waged by the Portugese was a savage one admittedly, but it was a question of wiping out Mohamedan Plague'. ফলে বলা যায় ইউরোপের বামিয়ানরা রক্ষা পেয়েছে।

অযোধ্যায় যেটা ঘটেছে সেটা পুনর্মন্দিরীকরণ। মধ্যিখানে কোনো মিউজিয়ামের গল্প নেই। ১৩৩৪ সালের তুলনায় মির বাকি নির্মিত সৌধটি সম্পদ, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য সুষমা কোনো দিক দিয়েই আকর্ষণীয় ছিল না। কোনো ধর্মপরায়ন মুসলমান সেখানে প্রার্থনা করত না। অযোধ্যার জনৈক মুসলমান তাজ দর্শনকালে আমাকে বলেছিল পশ্চিম মুখে না ঢুকে, মূর্তি ছাপা দেওয়ালের খণ্ডাহারে সে বাবরি মসজিদে নামাজ পড়তে অনিচ্ছুক।

১৯৮৩ সালে মুম্বাইয়ের এলফিনস্টোন কলেজ থেকে ভি টি স্টেশনে আসার পথে রাস্তা জোড়া এক বিশাল জুলুসের মুখোমুখি হয়েছিলাম। সেই মিছিল থেকে ছিটকে এসে এক যুবক রামচন্দ্রের কারাবন্দি একটা ছোট্ট রঙিন ছবি আমার হাতে দিয়েছিল। ছবির তলায় লেখা, 'আগে বঢ়ো, জোরসে বোলো, জনমভূমিকা তালা তোড়ো।' সেদিনই অযোধ্যা মামলার কথা প্রথম জানি। তালা খুলিয়েছিলেন আমাদের অকালপ্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

মাতামহর মতো তিনি মেকিয়াভেলিপন্থী বোধ হয় ছিলেন না। থাকলে সমস্যাটিকে জিইয়ে রেখে আরো পাঁচশো বছর হয়তো কাটানো যেত। আযোধ্যায় মসজিদ বানানো, মক্কায় কৃষ্ণমন্দির নির্মাণের সমতুল। কাশীর জ্ঞানবাপী মসজিদের প্লিন্থ-এ হিন্দু স্থাপত্যতো প্রকাশ্যে দেখা যায়।

তুরস্ক মূলে যায়নি। ১৩৩৪-এ থেমেছে। ভারতের সমস্যা বাইনারি। নরেন্দ্র মোদী মূলে গেলেন। তাই চটেছেন ওয়াইসি নামক ভদ্রলোক। প্রধানমন্ত্রীকে তিনি 'সেকুলার' হতে বলেছেন, যে বিচিত্র শব্দটি আমাদের সংবিধানে ইন্টার্পোলেট করেছেন ইন্দিরা গান্ধী। পৃথিবীর কোনো সভ্য, আধুনিক, উন্নত দেশ এই আধিক্যে (আদিখ্যেতায়?) ভোগে না। নিজের দেশকে সেকুলার বলাটা মানুষকে 'মনুষ্যত্ব যুক্ত মানুষ' ট্যাগ পৈতের মতো বহন করার সমান। আধুনিক দেশ মাত্রই সেকুলার। বরং মুসলমান প্রধান কোনো দেশে সেকুলারিজম চীনে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মতোই অনুপস্থিত।

অবশ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার-কালার টিভির মতো হসপিটাল বনাম মন্দিরের যুক্তিতে নাস্তিক ফ্যান্টাসি চর্চার অবকাশও এখানে থাকবে।

সব দেশেই হিন্দু কমরেডরা এক আজব চিজ

শিতাংশু গুহ

'ঈদুল আযহা' বা কোরবানির ইদ চলে গেল। প্রবল বন্যা ও করোনা ভাইরাসের মধ্যে যতটা সম্ভব মুসলমানরা ইদের আনন্দ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। কোরবানির ইদে পশু কোরবানি হবে সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু একজন কমরেড যখন কোরবানি দেন, সেটি চমকপ্রদ। তাও সেই কমরেড যদি হিন্দু হন, তবে তো কথাই নেই! বরিশালের বাসদ নেত্রী কমরেড ডাঃ মনীষা চক্রবর্তী গরু জবাই দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গোমাংস গরিব মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। একজন অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিমও তাঁর মুসলমান কর্মী ও গরিবদের জন্যে খাসি কোরবানি দিয়ে আলোচনায় এসেছেন। আরও একজন বিএনপি নেত্রী অপর্ণা রায় ঢাকঢোল পিটিয়ে ইদে মুসলিম উম্মার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন। হয়তো এসব দেখে সামাজিক মাধ্যমে আব্দুল্লাহ এন নোমান বলেছেন, 'ধর্ম' যার যার, 'গরুর মাংস সবার'।

এখানেই শেষ নয়। ক্রিকেটার মুশফিকুর রহমান গরু জবাইয়ের রক্তাক্ত ছুরি হাতে নিয়ে নিজেই নিজের ছবি পোস্ট করেছেন। বেশকিছু মানুষ এটি পছন্দ করছেন। অনেকে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কিছুদিন আগে ক্রিকেটার সৌম্য সরকার দুর্গাপূজার ছবি পোস্ট করেছিলেন, এই মুশফিকুর রহমান তখন এ ধরনের ছবি পোস্ট না করার পরামর্শ দিয়ে সৌম্যকে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ এসব পছন্দ করে না'। এ সবের মধ্যেই চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার দক্ষিণ ধর্মপুর মগধেশ্বরী মন্দিরে কারা যেন গরুর মাংস ফেলে গেছে। রাঙ্গুনিয়ার এক হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকানেও একই কাণ্ড ঘটেছে। এ ধরনের ঘটনা প্রতি বছর ঘটে। প্রশাসন খুব একটা মাথা ঘামায় না। কোরবানি ধর্মাচারের অংশ, কিন্তু যাঁরা গুরুর হাড়গোড় হিন্দুদের মন্দিরে ফেলেন তাঁদের বোঝা উচিত যে, ওটি ধর্ম নয়। অন্য ঘটনাগুলো তেমন আলোচিত না হলেও ডাক্তার মনীষা চক্রবর্তীর গরু কোরবানি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে।

বাসদ এনিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে হিন্দুদের বেদের রেফারেন্স টেনে বলতে চেয়েছেন, মনীষা একটি মহৎ কাজ করেছেন। ভাবখানা এই যে, বাসদ বেদকে সংগঠনের

ডা: মনীষা চক্রবর্তী

বিদ্যা সিনহা মিম

গঠনতন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করবেন। বলা হচ্ছে, বাসদ ডাঃ মনীষাকে কোরবানি দিতে বাধ্য করেছে। প্রশ্ন হলো, কমরেড খালেকুজ্জান নিজে কেন এ মহৎ কাজটি করলেন না অথবা তিনি কি পারবেন অন্য কোন মাংস উপজাতিদের মধ্যে বিতরণ করতে? বাসদ বা বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের তো ধর্ম নিয়ে মাথাব্যথা থাকার কোনো কারণ ছিল না। ডাঃ মনীষা অবশ্য নিজেকে মানুষ হিসেবে বর্ণনা করে একটি বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে সবাইকে মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এমনিতে ডাক্তার হিসেবে তিনি মানুষের সেবা করে থাকেন। গরিবের জন্যে গরু কোরবানি দেয়াটা জনসেবা বটে! তবে লক্ষ্য হয়তো ভোট। প্রচার বা নির্বাচনে জয়ের জন্যে কুরবানিকে ব্যবহার করা কতটা সমীচীন, তা কমরেডদের মাথায় ঢুকবে না।

এ নিয়ে বিতর্ক বিতণ্ডায় পরিণত হোক তা কাম্য নয়। তবে ডাক্তার মনীষা মেয়র হতে চান, তিনি মেয়র হবেন। ভোট চাই। গতবার নির্বাচনে অল্পের জন্যে তিনি ভালোভাবে হেরেছেন। এবার ভোট বাড়াতে হয়তো তাই কমরেডের ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। লোকে বলছে, সম্প্রতি বরিশাল কলেজের নাম অশ্বিনী কুমার দত্ত রাখার পক্ষে আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। এতে মানুষ তাঁকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে। ম্যাডাম ডাক্তার হয়তো সেই দুর্নাম ঘুচাতে এবার কোরবানি দিলেন। হিন্দুরা বলছেন, ডাক্তার মনীষা গরিব নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কাজ করছেন, ভালো কথা; কিন্তু বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুর পক্ষে তো তাঁর মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের হয় না? হটাৎ করে তিনি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের 'ধর্মকর্ম সমাজতন্ত্র' আঁকড়ে ধরলেন কেন? এ ফর্মুলায় কিন্তু বামফ্রন্টে জোয়ার আসেনি। ডঃ মোজাফফর আহমদ নিজে কখনো এই ফর্মুলায় নির্বাচনে জয়ের স্বপ্ন দেখেননি।

যদি ভোটের জন্যে ডাঃ মনীষা এ কাজ করে থাকেন তবে তিনি হতাশ হবেন। এতে ভোট কমবে। তদুপরি, নির্বাচনে জিততে কি আজকাল আর ভোট দরকার হয়? এরচেয়েও বড়ো প্রশ্ন, নৌকায় না উঠলে কি কমরেডরা নির্বাচনে জেতেন? আর একবার নৌকায় উঠে গেলে 'নাহিদ' বা 'ইনু' হতে কতক্ষন? বড়জোর 'মতিয়া'? ভারতের মতো বাংলাদেশের কমরেডরাও এক আজব চিজ! সবার ছেলে-মেয়ে আমেরিকায়, আর ওনারা 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' শ্লোগান দিয়ে লালঝান্ডা উড়িয়ে রেখেছেন। ব্যতিক্রম আছে, তবে 'ধর্মকর্ম সমাজতন্ত্র' মার্কা মেকি কমরেডের কাছে এরা নস্যি। একজন হিন্দু ইদে শুভেচ্ছা জানাবেন, মুসলমান বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যাবেন, এটি স্বাভাবিক। কিন্তু একজন হিন্দু কোরবানি দেবেন, এটি বেমানান। হয়তো এসব কারণে কেউ কেউ এটিকে বিতর্কিত করতে চাইছেন। অন্যরা বলছেন, এটি সম্প্রীতি ও প্রগতিশীলতার চমৎকার দৃষ্টান্ত। হিন্দুরা বিরক্ত। কেউ কেউ মনীষাকে যোগেন মণ্ডলের সাথে তুলনা করছেন।

মনীষা কি 'আপনি আচরি ধর্ম' শেখাতে চেয়েছেন? তিনি কী চেয়েছেন তা তিনি জানেন। তবে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ভালো নয়। শেষ করবো অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহার প্রসঙ্গে সামান্য দু'চারটি কথা বলে। মিমের ব্যাপারটা অনেকটা বোধগম্য। তাঁকে সিনেমা জগতে টিকে থাকতে হবে। বাংলাদেশে সিনেমায় 'হিন্দু মেয়ে মুসলিম ছেলে' প্রেম জমজমাট ব্যবসা।

অভিনেত্রী মিম এখনো হিন্দু আছেন বা ধর্মান্তরিত হননি, এই তো বেশি! কতদিন থাকতে পারবেন সেটা এক বিরাট প্রশ্ন। দেশের সিনেমা অঙ্গন বা বিনোদন জগতে প্রায় প্রতিটি হিন্দু নায়িকাকে ধর্মান্তরিত হতে হয়। সেটা পূর্ণিমা সেন থেকে অপু বিশ্বাস পর্যন্ত সবাই। ঢলিউডে টিকে থাকতে নায়িকাকে কারও না কাবও হাত ধরতে হয়। আর এই হাত ধরা মানেই 'জাত যাওয়া'। অন্যথায় সিনেমা জগৎ থেকে বিদায়। আমাদের সিনেমা 'চিররুগ্ন' হবার হয়তো এটিও একটি কারণ। আপাতত মনীষা বা মিম আলোচনা বন্ধ হলেই ভালো।

(লেখক নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশি)

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার গঙ্গাজলি যাত্রা

ডঃ নারায়ণ চক্রবর্তী

স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি একই বৃন্তে দুটি ফুলের সমাহার—সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ। আমাদের রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দিশাহীন, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে মাস্তুলভাঙা জাহাজের মতো দুলতে দুলতে চলেছে। বামফ্রন্টের সতত পরিবর্তনশীল শিক্ষানীতি গত দশ বছরে ব্যবসায়ী মানসিকতায় অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধগলিতে আবদ্ধ।

আমাদের রাজ্যে উচ্চশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ডিগ্রি কলেজ— গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট, প্রাইভেট কলেজ যার মধ্যে জেনারেল ও কারিগরি দু'ধরনের শিক্ষাই আছে। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়। এসবই শিক্ষামন্ত্রীর আদেশে চলে যিনি নাকি কারও 'অনুপ্রেরণায়' অনুপ্রাণিত। উপাচার্য ও প্রিন্সিপালরা মন্ত্রী মহোদয় ও সচিবের আদেশ পালনের কর্তব্য পালন করেন।

লক ডাউনের সময় যখন যোগ্য প্রশাসক ও আমলার দরকার তখন উপাচার্যরা 'ইউনিয়ন' গঠন করে শিক্ষামন্ত্রী ও 'অনুপ্রেরণার' স্তুতিতে ব্যস্ত। এই কঠিন সময়ে যখন সঠিক দিশা দেখানোর প্রয়োজন তখন যে কোনো সমস্যার হাকিমি টোটকার মতো তাৎক্ষণিক সমাধান করেন শিক্ষামন্ত্রী। এসব দেখে ছোটোবেলার পড়া 'হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রী'র গল্প মনে পড়ে। শিক্ষা জগৎ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকলে কোনো শিক্ষিত মানুষ কি বলতে পারেন যে ''আমরা মাইনে দিই তাই ওরা আমাদের কথা শুনতে বাধ্য''? একটা প্রভুত্ববাদী অযোগ্যতা এখন শিক্ষাদপ্তরের কর্মপদ্ধতির মেরুদণ্ড।

উচ্চশিক্ষা কাউন্সিল সম্পর্কে রাজ্যসরকারের কর্মপদ্ধতি তার মানসিকতারই প্রতিফলন। এটি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও UGC দ্বারা গঠিত ও বিজ্ঞপিত একটি স্বশাসিত সংস্থা। প্রতি রাজ্যে সেই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান যা সংক্ষেপে RUSA নামে পরিচিত। ২০১৩ সালে গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিম। এই স্কিমে কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চশিক্ষাতে গবেষণা সহ সমস্তরকম উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। এই বরাদ্দ উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের মাধ্যমে বণ্টনের কথা বিজ্ঞপ্তিতে বলা আছে। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা কাউন্সিলের বর্তমান গঠনে বিভাগীয় মন্ত্রী চেয়ারম্যান, বিভাগীয় সচিব ভাইস-চেয়ারম্যান ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য একজন কর্মী মেম্বার-সেক্রেটারি। এমন আর কোনো রাজ্যে নেই। উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে ব্যায় করার জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ পাওয়া যাচ্ছে তা এইসব শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীনদের হাতে পড়ে কী হচ্ছে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

২৩.১২.২০১৯ তারিখে প্রকাশিত State Aided College Teachers এর G.O. অনুযায়ী জানা যায় যে সার্ভিস কমিশনকে এড়িয়ে চটজলদি সমাধান হিসেবে যে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, অথিতি শিক্ষক ও অস্থায়ী শিক্ষকদের বিভিন্ন কলেজে নেয়া হয়েছিল তাদের সকলকে স্থায়ী করে SACT নামে নামমাত্র মাইনেতে নিয়োগ করা হলো। এখানে যাদের UGS কর্তৃক গৃহীত ন্যূনতম যোগ্যতা আছে তাঁদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত করে LDC-র মতো বেতন ও যাদের সেই যোগ্যতা নেই (!) তাঁদের পিওন, বেয়ারা ইত্যাদির সমতুল বেতন দেওয়া হলো। পুলিশে যেমন যোগ্যতাবিহীন 'সিভিক পুলিশ' নামক গেস্টাপো বাহিনী হয়েছে তেমনি 'সিভিক মাস্টার' বানানো হলো। এতে কলেজ সার্ভিস কমিশনের কাযক্ষমতা খর্ব করাই যে হলো তা নয়, অনেক অযোগ্য, অকর্মণ্য ও অদক্ষ শিক্ষককুল সরকারি স্বীকৃতির মাধ্যমে 'ছাত্রবধ যজ্ঞে' পুরোহিত নিযুক্ত হলেন। সরকার স্বল্পমূল্যে দলীয় কাজে নিযুক্ত করার জন্য প্রচুর কর্মী পেল যা ভোটের সময়ে দলের 'সম্পদ' হবে। যেহেতু শিক্ষা যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত, আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও UGC-র এই G. O-র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে Public Service Commission ও College Service Commission -কে ঠুটো জগন্নাথ বানিয়ে অযোগ্য দলীয় কর্মীদের নিয়োগ পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার উপরেই আঘাত হেনেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে দলতন্ত্রীকরণের আরেক উদাহরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কলেজের অধ্যক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ। অন্তত পাঁচজন এমন উপাচার্য আছেন যাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর অভিজ্ঞতা নেই। আবার এমন উপাচার্য আছেন যাঁর কোনো প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছাড়াই উপাচার্য হয়েছেন। এখানে দলীয় আনুগত্য ও উপযুক্ত যোগাযোগে অনুপ্রাণিত হওয়াই শুধু বিবেচ্য। দলীয় শিক্ষক সংগঠনের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এই একই যোগ্যতায় অধ্যক্ষ হতে পারেন।

চরম অনৈতিকতাদুষ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রশাসন লক ডাউন পর্যায় অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই প্রশাসনের আরেক দুর্নীতিস্তম্ভ হলো ছাত্রভর্তি। মুখে অনেক হম্বিতম্বি করলেও প্রশাসনের উচ্চতম থেকে নিম্নতর সকলেই শাসক দলের ছাত্র নামধারী 'সশস্ত্র নেতা'দের হাতে ক্রীড়নক। লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হয় ছাত্রভর্তির সময়। এখানে স্বচ্ছতা অন্তর্নিহিত, যোগ্যতা পদদলিত। জনমানসে সঞ্চারিত যে তীব্র ক্ষোভ শিক্ষাব্যবস্থার উপর তার

একটা বড়ো কারণ এটা। অনেক 'খরচ' করে ভর্তি, 'তারপর সিভিক শিক্ষক'দের দ্বারা শিক্ষাদান, তারপর আছে কোচিং ক্লাসের খরচ! ছাত্র-অভিভাবকরা তিতিবিরক্ত। মুড়ি মুড়কির মতো কলেজে, ইউনিভার্সিটির নামে বাড়ি তৈরি ও খারাপ infrastructure-এর মধ্যে যাঁরা যোগ্য শিক্ষক তাঁরাও বিশেষ কিছু করতে পারছেন না।

এই রাজ্যে net connection -এর হাল, স্মার্টফোন ও net এর খরচ ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে মফস্‌সলের ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ ছাত্র অনলাইন শিক্ষাদানের সুযোগ থেকে কার্যকরীভাবে বঞ্চিত। সুতরাং তাদের জন্য সঠিক উপায় অবলম্বন করে শিক্ষাদানের বদলে ওই হেকিমি দাওয়াই ৪০% ও ২০% এর ফর্মুলা। কোনো পরীক্ষা নয়। আগের উপস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন নামক চরম অস্বচ্ছ ব্যবস্থা। পরীক্ষা ও নম্বরে অস্বচ্ছতা থাকলে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে পড়ে। ঠিক তাই হলো। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল যে ডিগ্রির ফাইনাল পরীক্ষা নিতেই হবে। ব্যাস, বঙ্গীয় বিশেষজ্ঞরা চুপ। হালে পানি পায় না। আবার টোটকা ৩০ সেপ্টেম্বরের গাইডলাইনের বিরোধিতা রাজ্যের।

এরপর আসি শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রসঙ্গে। এটি যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত নীতি, এটি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বামফ্রন্টের সময়েই এখানে অপরিকল্পিতভাবে কারিগরি শিক্ষার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এদের অপরিকল্পিত বৃদ্ধির ফলে এদের গুণগতমান নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকে। অতিউচ্চহারের বেতন নিয়ে যে ছাত্ররা এইসব কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হচ্ছে তাদের গুণগত প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকেই যায়। এদের শিক্ষক নিয়োগের কোন নিয়ম মানা হয় না। চাকরির স্থায়ীত্ব ও বেতনের কোন স্থিরতা নেই। এগুলো কিন্তু রাজ্যসরকারের দেখার কথা। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে বেসরকারী শিক্ষার মান অনেক উন্নত। এই অবনতির দায় কিন্তু অনেকাংশে এই সরকারের উপরেই বর্তায়।

পরিশেষে জানাই, গত চল্লিশ বছর উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন পদে থাকার অভিজ্ঞতায় এবং তার আগের দশ বছর ছাত্র হিসেবে, অর্ধশতাব্দীর উচ্চশিক্ষার ক্রমাবনতি আমাকে পীড়া দেয়। এই অযোগ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও কলসালটেন্ট ডিরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ বায়োটেক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন)

With Best Compliments From -

A Well Wisher

ইতিহাসপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে

দেবব্রত ঘোষ

কোনো দেশের, বিশেষ ভাবে রাজনৈতিক ভাবে পরাধীন দেশের জনমানসকে বিভ্রান্ত করতে হলে সেই দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে আক্রমণ করাই সহজতম পন্থা — এই সত্যটা ইউরোপের খ্রিস্টীয়-পণ্ডিতদের জানা ছিল। এই ফাঁদে পা দিয়েছিলেন আমাদের দেশেরই অনেক পাশ্চাত্য খেতাবলোভী স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী ও ঐতিহাসিক , যাঁদের অন্যতম ছিলেন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর যিনি জার্মানি থেকে প্রকাশিত Vaisnavism, Saivism and minor Religious Systems নামক গ্রন্থে এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে পড়ে লাগলেন। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরই প্রথম ভারতীয় ঐতিহাসিক যিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন শিশুকৃষ্ণ (গোপাল) সম্পর্কিত কাহিনিগুলো আভীর বা আহির নামে পরিচিত একশ্রেণীর গোচারণ-বৃত্তিধারী উপজাতীয় মানুষদের সমাজ ও কাহিনি থেকে আহরিত হয়েছিল। এই আভীর বা আহির শ্রেণীর মানুষেরাই নাকি খ্রিস্ট নামখানিও বহন করে এনেছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী বৃন্দাবনের গোপিনীদের শারীরিক বর্ণনাও নাকি আভীর কুলকন্যাদের অঙ্গবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কৃষ্ণ ও গোপিনীদের লীলাবিলাসের মধ্যেও আভীর রমণীদের শিথিল মানসিকতা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালেও ভাণ্ডারকর একই মতবাদ প্রচার করলেন— ‘‘The dalliance of Krishna with cowherdesses wich introduced and element inconsistent with the advance of morality into the Vasudeva religion was also an after-growth, consequent after the freer intercourse between the wandering Abhiras and their more civilized Aryan neighburs.’’ ভাণ্ডারকর গোকুলে নন্দরাজার আশ্রয়ে মাতা যশোদার আদরে বেড়ে ওঠা কৃষ্ণের কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার করেন না। তিনি তাঁর ধারণায় অবিচল যে সিরিয়া কিংবা এশিয়া মাইনর থেকে আগত আভীর জাতির মানুষেরা যিশুর উপাখ্যান বয়ে এনেছিল যেগুলো পরবর্তী সময়ে রূপান্তরিত হয়েছে গোপাল কৃষ্ণের নামে। তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসকেরা এই মতের ইঙ্গিতটাকে সমাদরে স্বাগত জানাতে কালক্ষেপ করেনি। ভাণ্ডারকর নাইট উপাধি পেয়ে গেলেন।

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে— ‘তদ্বৈতদ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উকতবা উবাচ অপিপাস এব স বভুব-সোন্ত বেলায়াম এতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষতম অসি, অচততম অসি, প্রাণ সংশতিততমসীতি।’ এই শ্লোকের মধ্যে কৃষ্ণ যে অঙ্গিরা গোত্রীয় ঘোর নামক ঋষির শিষ্য তার কোনো উল্লেখ নেই। কৃষ্ণ আসলে সান্দীপনি মুনির শিষ্য এবং তাঁর পড়াশুনো সমাপ্ত হয়েছে উজ্জয়িনীর আশ্রমে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ‘বাসুদেব’ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে নারায়ণ ও বিষ্ণুর সমান কক্ষায়। বাসুদেব মানে বসুদেবের পুত্র। এখানেই আপত্তি তুলেন জার্মান পণ্ডিত জ্যাকবি। তাঁর মতে বৈদিক যুগ যখন প্রায় শেষ হয়ে

এলো তখন বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ অবশ্যই নারায়ণ ও বিষ্ণুর সমকক্ষায় পূজিত হতেন কিন্তু দেবকীর পুত্র কৃষ্ণ যেহেতু ছান্দোগ্য উপনিষদে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হিসেবে পরিচিত, তাই তিনি পুজো পেতে শুরু করেন অনেক পর থেকে।

যার মানে দাঁড়াচ্ছে দেবকীর পুত্র কৃষ্ণের বিষ্ণু হিসেবে পূজিত হতে যত সময় লেগেছে, বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণের সময় লেগেছে তার চেয়ে বেশি। পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর মধ্যে বয়সের এই শতাব্দীর ব্যবধান যে ধোপে টেকে না সে সহজ সত্যটা কোনো পণ্ডিতই বুঝলেন না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে একবার মাত্র কৃষ্ণ নামটি উচ্চারিত হওয়াতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের ধারণা হয়েছে (সঙ্গে সঙ্গে তাদের একান্ত গুণগ্রাহী ভারতীয় পণ্ডিত মহলের একাংশের) পিতা বসুদেবের নামে পরিচিত ছেলেটির এবং মাতা দেবকীর নামে পরিচিত ছেলেটি ভিন্ন ব্যক্তি এবং অবশ্যই ভিন্ন শতাব্দীর। এই সহজ সত্যটা অতি বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মাথায় ঢুকলো না যে একই ব্যক্তি কখনো মায়ের নামে, কখনো বাপের নামে পরিচিত হতে পারেন এবং তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটিতে (১৯১৫) এ বি কিথ কিন্তু লিখলেন, 'The seperation of Vasudeva and Krishna as two different entities, it is impossible to justify.' ভাণ্ডারকরের আত্মঘাতী থিয়োরির যদি কেউ সার্থক প্রতিবাদ করে থাকেন তিনি কিন্তু কিথ সাহেবই। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী আবার তাঁর গ্রন্থ Materials for the study of early history of the Vaisnab Sect বইতে শ্লোক ধরে ধরে প্রমাণ করেছেন যে দুই কৃষ্ণ আদপে একই ব্যক্তি। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নরেন্দ্রনাথ লাহা বলেছেন যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির বহিরঙ্গ বিচারেই তৎপরতা দেখিয়েছেন কিন্তু কখনোই অন্তরঙ্গ গভীরতায় প্রবেশ করতে পারেননি (studies in Indian history and culture-1925) , যেখানে অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিত ইউরোপীয় ভাবধারার অনুকরণে ও অনুসরণে পাশ্চাত্যের মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন এবং তাদের সিদ্ধান্তকেই প্রামাণিক বলে মেনে নিয়েছেন, সেখানে নরেন্দ্রনাথ লাহা, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, কাশীরাম ত্র্যম্বক তেলং, রমাপ্রসাদ চন্দ, বালগঙ্গধর তিলক ছিলেন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম যাঁরা মিথ্যার সঙ্গে আপোশ করেননি।

ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬তম সূক্তের ২৩তম ঋকে ও ১১৭তম সূক্তের সপ্তম ঋকে বিশ্বকায়ের পিতা ঋষি কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে। আবার অষ্টম মণ্ডলের ৯৬তম সূক্তে অংশুমতী নদীর তীরবাসী অনার্য রাজা কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে যিনি ইন্দ্রের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ঋকবেদে যে একাধিক কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে তারা কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত দেবকীনন্দন কৃষ্ণের থেকে আলাদা ব্যক্তি। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখিত কৃষ্ণ, গোকুলে নন্দরাজার গৃহে (গোপাল) কৃষ্ণ ও মহাভারতের পার্থসারথি-কৃষ্ণ একই ব্যক্তি। ব্যাসদেব বা তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা যেমন বৈশম্পায়ন, পৈল, জৈমিনি, সুমন্ত শুক, উগ্রশ্রবা সৌতি কেউই দ্বারকা-মহাভারতের পার্থসারথি-কৃষ্ণ এবং গোকুল-বৃন্দাবনের গোপাল-কৃষ্ণকে আলাদা আলাদা মানুষ বলে উল্লেখ করেননি।

পানিনি কিন্তু ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মানুষ। তিনি কিংবা তাঁর ৩০০ বছর পরবর্তী পতঞ্জলি (২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের) দুজনের কেউই বৃন্দাবনের গোপাল-কৃষ্ণ এবং মহাভারতের (বা দ্বারকার) পার্থসারথি কৃষ্ণকে আলাদা মানুষ বলে উল্লেখ করেননি। মহাভারতে কৃষ্ণের বাল্যজীবনের উল্লেখ নেই বলে তাঁর বাল্যজীবন বলে কিছু ছিল না এই থিয়োরি ধোপে টেকে না। মহাভারতের ঠিক পরবর্তী খিল হরিবংশ ও ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের শৈশব, বাল্য ও কিশোর বয়সের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ভাগবত পুরাণের কথক (বা লেখক) কিন্তু একই ব্যাসদেব যিনি মহাভারত সংকলনের কিছুকাল পরেই ভাগবত পুরাণ রচনা শুরু করেছিলেন। ভাগবত পুরাণের পরবর্তীকালে কিছু কিছু শ্লোক বা ঘটনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এটা ঠিক, কিন্তু কৃষ্ণের শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের কাহিনি অবিকৃত অবস্থায় ছিল। ব্যাসপুত্র শুকদেব পরীক্ষিতের মৃত্যুর আগে কৃষ্ণের জীবনের অনেক ঘটনা বিবৃত করেছেন যার মধ্যে শৈশব, বাল্য ও কিশোর বয়সের কথাও ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের ধাক্কা সামলাতে পারেননি ভারতের সমকালীন খ্রিস্টান পাদরিরা। দেশীয় কিছু মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দের বিরোধিতা শুধু নয়, তাঁর চরিত্রহরণও করেছিল খ্রিস্টান মিশনারিরা। আর জি ভাণ্ডারকর যখন কৃষ্ণ নিন্দায় বা মহাভারতের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত তখন স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত ছিলেন না বলে ভাণ্ডারকরের কিছু সুবিধে হয়ে গিয়েছিল হিন্দু-পুরাণ কাহিনিকে বিকৃত করে একাধিক কৃষ্ণকে আবিষ্কার করতে।

সনাতন ধর্মে চাররকম বিদ্যার কথা বলা হয়েছে— বেদ, আন্বীক্ষিকী (যুক্তি-তর্ক-দর্শন), বার্তা (অর্থনীতি) ও দণ্ডনীতি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)। বেদ শব্দের মধ্যে চিকিৎসা (আয়ুর্বেদশাস্ত্র) সহ বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত। দর্শনের মধ্যে ভারতীয় ষড়দর্শনের সবগুলোই রয়েছে। অর্থনীতির মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহ-সহ দেশ ও সমাজ উন্নয়ন-পরিকল্পনা রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে ইতিহাস, কূটনীতি, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সবই অন্তভুক্ত। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি বিষয়ে অন্তিম উপদেশ দেবার সময় ভীষ্ম বলেছেন কৃষ্ণই সামগ্রিক বিদ্যায় সম্যক পারদর্শী, যে বিদ্যা তিনি উজ্জয়িনীতে সান্দীপনী মুনির কাছে শিক্ষার সময়েই আয়ত্ত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের এক ব্যাপক সংজ্ঞা

দিয়েছেন। সভ্যতা একটি বিশিষ্ট জীবনধারা, মানবতার এক অভিযান। কোনো জাতির জৈবিক একতা বা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তার সারমর্ম পাওয়া যাবে না, যে সব মূল্যবোধ তাদের সৃষ্টি করে ও রক্ষা করে তাদের মধ্যেই সভ্যতার মর্ম নিহিত। প্রত্যেক সভ্যতা একটা ধর্মের বহিঃপ্রকাশ, কেননা ধর্ম মানেই পরম মূল্যে বিশ্বাস এবং তা লাভ করার জন্য জীবনচারণা। যা সৃষ্টিকে ধারণ করে আছে তাই ধর্ম। মহাভারতেই বলা হচ্ছে ধর্মের দ্বারাই সকল জীবের বৃদ্ধি ও অভ্যুদয় হয় — ধর্মে বর্ধতি বর্ধন্তি সর্বভূতানি সর্বদা (শান্তিপর্ব, মহাভারত)। ধর্ম হলো সেই জিনিস যা সমস্ত লোকস্থিতিকে ধারণ করে রাখে — ধর্ম ধারয়তি প্রজাঃ (উদ্যোগপর্ব, মহাভারত)। এই মহাভারতেই বলা হয়েছে— ধর্মে তিষ্ঠতি ভূতানি (শান্তিপর্ব,মহাভারত)। আবার যা থেকে জীবনে সকল ধনের প্রাপ্তি ঘটে সেটাও ধর্ম — ধনাৎ স্রবতি ধর্মোঃ (শান্তিপূর্ব, মহাভারত)। ধর্ম হলো সেই মহাশক্তি যা সমস্ত জগৎ ও জীবনকে ধারণ করে রয়েছে। আবার যাকে অবলম্বন করে আমরা প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা, পঙ্কিলতা, গ্লানি ও আত্মস্বার্থের ওপরে মহান উদার নিঃস্বার্থ ভালোবাসাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি সেটাও ধর্ম। ধর্ম বলতে ফুল-বেলপাতা-তুলসীপাতা, ফল-নৈবেদ্য, মন্ত্রোচ্চারণ বোঝায় না, মন্দির-মসজিদ-গির্জায় গিয়ে প্রার্থনাকেও বোঝায় না।

শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত সত্যের ওপর — সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ (শান্তিপর্ব, মহাভারত)। ভাবনায় উদারতা, কর্মে নিষ্কামতা, ভক্তিতে শরণাগতি, জ্ঞানে সর্বভূতে ব্রহ্মভাব, ধ্যানে চিত্তসংযোগ, নীতিতে সাম্যবুদ্ধি, উপাসনায় জীবসেবা, সাধনায় ত্যাগের অনুশীলন, জীবনযাপনে স্বধর্মপালন — এই হলো ধর্মের মূল কথা। দয়া শব্দের অর্থ হলো সকলের সুখের জন্য চেষ্টা করা, দান শব্দের অর্থ হলো যা সকলকে রক্ষা করে, ধৈর্য শব্দের মানে হলো নিজের ধর্মে ঠিক থাকা। তাই যে শিক্ষ মানুষকে ভাবুক, বিবেকবান ও হৃদয়বান করে, আপোশহীন করে, অপ্রেম থেকে প্রেমে, অন্ধকার থেকে আলোয়, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে নিয়ে যায় সেটাও ধর্ম। ধর্মের অনেকান্ত সংজ্ঞা, অনেকান্ত রূপ। সুখ ও শান্তির জন্য বাহ্যিক বস্তুর ওপর নির্ভর না করে যত ভেতরের ওপর আমরা নির্ভর করবো ততই আমরা অন্তর্জ্যোতি হবো। সেটাও ধর্ম।

বিশ্বের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণই প্রথম ব্যক্তি যিনি একজন স্ত্রীলোককে রাজসিংহাসনে বসিয়েছিলেন। তৎকালীন কাশ্মীরের রাজা গোনন্দ জরসন্ধের প্ররোচনায় পা দিয়ে যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বলরামের হাতে নিহত হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোনন্দের পুত্র দামোদরকে কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে বসান। আরও পরে গান্ধার রাজ্যের এক স্বয়ংম্বর সভায় আমন্ত্রিত যাদবদের দামোদর এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে অকারণে আক্রমণ করেন, তখন কৃষ্ণের হাতে দামোদরের মৃত্যু হয়। দামোদরের বিধবা পত্নী যশোবতীকে (তখন যশোবতী অন্তঃসত্ত্বা) কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীর দখল করেননি। চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের হাতে মৃত্যুবরণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের ছেলে ধৃষ্টকেতুকেই চেদি রাজ্যের সিংহাসনে বসান। জরাসন্ধ বধের পরে মগধ দখল না করে জরাসন্ধের ছেলে সহদেবকেই মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। নিরাসক্ত ও নিয়ন্ত্রিত এই ক্ষাত্রশক্তির জন্যই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম। কৃষ্ণের এই আদর্শ ক্ষাত্রজনোচিত কর্ম দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের রাজধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর জীবনের এই দিকটা কিন্তু পাশ্চাত্য-প্রভাবিত ঐতিহাসিক ও গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে স্বেচ্ছাকৃতভাবেই।

মহাভারতে এমন অনেক ঋষিকেই আমরা সভাপর্বে, বনপর্বে, ভীষ্মপর্বে বা অন্যান্য পর্বে সশরীরে উপস্থিত থাকতে দেখছি যারা রামায়ণের যুগে কিংবা তারও আগে স্বদেহে বর্তমান ছিলেন। যেমন— বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম, লোমশ, মার্কণ্ডেয়, কপিল । এই ঋষিরা মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থাকাটার মানে এই নয় যে, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত। এরা সকলেই বিশিষ্ট বিদ্যাসম্প্রদায়ের প্রবর্তক আদি ঋষি এবং এঁদের পরবর্তী শিষ্য- প্রশিষ্যরা পরম্পরাক্রমে পরবর্তীকালেও আদি ঋষিদের নামেই পরিচিত ছিলেন। প্রক্ষিপ্তবাদের প্রশ্ন সর্বত্র ওঠে না, অন্তত এই ক্ষেত্রে তো ওঠেই না। আরেকটা কথা— কৃষ্ণের ভগবদরূপ কিন্তু ভীষ্মের মুখেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল— নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ্যহিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। সমকালীন বিখ্যাত ঋষি মৈত্রেয় ও কন্ব (ইনি কিন্তু শকুন্তলার পালক পিতা কন্ব মুনি নন) এবং ব্যাসদেবের কাছেও কৃষ্ণ ভগবদস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত। মহাভারতের যুদ্ধের সময়কাল কিন্তু কম করেও ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কাজেই কৃষ্ণের ভগবদসত্তা যিশুখ্রিস্টের জন্মের দেড় হাজার বছর আগেও প্রচলিত ছিল।

(শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

With Best Compliments From -

A Well Wisher

শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব প্রশ্নাতীত

দুর্গাপদ ঘোষ

মাস কয়েক আগে একটা সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকরা গুজরাটের দ্বারকাধীশ মন্দির থেকে ১২ মাইল মতো দূরে আরব সাগরের জলের তলায় গিয়ে এক বিস্ময়কর নগর সভ্যতার নিদর্শনের ছবি ক্যামেরাবন্দি করে এনেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে ২০ ফুটের মতো জলের তলায় সেই নগর ছিল পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। অবশ্য এই ধ্বংসাবশেষের কথা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৭৯ সালে। তারপর থেকে এ নিয়ে নিরন্তর নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। সেই সঙ্গে ভারত-শ্রীলঙ্কা সংযোগকারী রামসেতুর মতো এই নগরী কবে এবং কে নির্মাণ করেন তা নিয়ে চলছে বিস্তর বিতর্কের কূটকাচালি। যিনি এই প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ আবিষ্কার করেন তিনি একজন বিশ্বখ্যাত সমুদ্র পুরাবিদ (marine archaeologist) তথা হায়দরাবাদ কেন্দ্রিক 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ওসিয়ান টেকনোলজি'-র তৎকালীন ডিরেক্টর ড. এস আর রাও। ১৯৯০ দশকের শেষের দিকে কেন্দ্র সরকারের কাছে তিনি যে রিপোর্ট জমা দেন তার শিরোনাম রাখেন 'Golden City of Dwaraka' (সুবর্ণ নগরী দ্বারকা)। আর রিপোর্টের ভেতরে লেখেন, 'founded by Lord Srikrishna's (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা স্থাপিত)। কার্বন-১৪ বা কার্বন ডেটিং পরীক্ষায় বয়স নিরূপিত হয়েছে প্রায় ৫ হাজার বছর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষকদের কেউ কেউ গাণিতিক প্রতিগণনা (mathematical back calcutation) করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে জন্মতারিখ নির্ধারণ করেছেন সেটাও এখন থেকে ৫ হাজার বছরের মতো।)

আরব সাগরে উল্লেখিত দ্বারকা নগরী কেমন ছিল, কত বড়ো ছিল, তাতে কী কী ছিল না ছিল, প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষে কীসের কীসের নিদর্শন মিলেছে না মিলেছে, সেটা বাস্তুশিল্প এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়। এখানে আলোচ্য বিষয় হলো, নগরটা যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা স্থাপিত হয়ে থাকে তবে শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে বাস্তব তথা ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এখন পর্যন্ত এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়া লিখিত তথ্যপ্রমাণ বলতে যা যা আমাদের জ্ঞাত তাহলো মুখ্যত কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ মহর্ষি ব্যাসদেব প্রণীত মহাভারত, ভাগবত পুরাণ-সহ বিভিন্ন পুরাণ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, বেদ-বেদাঙ্গ ইত্যাদি কাব্যাকার গ্রন্থ। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাঁদের কচ্ছধারী ভারতীয় পণ্ডিতদের একটা বড়ো অংশ মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থ, এমনকী বেদকেও যথাক্রমে মহাকাব্য—কাব্যের বাইরে ইতিহাসের অঙ্গ মানতেই রাজি নন এখনও। অতএব, প্রশ্ন থেকে যায় যে একটা আস্ত নগরীর অস্তিত্ব রয়েছে অথচ যিনি তার প্রতিষ্ঠাতা বলে মহাভারতে লিখিত বর্ণনা রয়েছে তিনি মিথ বা কাল্পনিক এমন অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার তো হতে পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব ছিল, তিনি এই মাটির পৃথিবীতে চলাফেরা করা মানুষ ছিলেন এবং অতুলনীয় কীর্তির জন্য ক্রমে ভগবান রূপে প্রতিভাত হয়েছেন এটাই বাস্তব। যেমন মহাত্মা বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধ হয়ে মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহরূপে পূজিত হচ্ছেন, যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমপুরুষ থেকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কীর্তির জন্যই মানুষ ভগবান হয়ে থাকেন, চিরকালের জন্য জীবিত থাকেন—কীর্তিযস্য স জীবতি। আপন কীর্তির

জন্য মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ যে সেই মার্গের ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি ছিলেন নানা গ্রন্থে, নানা বর্ণনায় আজ তা স্বীকৃত। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার ২০১৭ সালের ৭ আগস্ট সংখ্যায় প্রীতীশ তালুকদার শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের বাস্তবতা প্রমাণ করতে বহু প্রামাণ্য গ্রন্থের থেকে যে বিপুল পরিমাণে উদাহরণ ও উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন এককথায় তা পর্যাপ্ত। এরপর আর খুব বেশি উদাহরণের প্রয়োজন পড়ে না। তবে সেসবই হলো কাব্যাশ্রয়ী গ্রন্থ। কিন্তু ড. এস আর রাও যে প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন তা একেবারে পাথুরে দলিলের মতো। শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় কীর্তির এক স্থায়ী ও জলজ্যান্ত প্রমাণ। সকলেই এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হলো ইতিহাসের সবচাইতে মজবুত সোপান, অক্ষয় ও অলঙ্ঘনীয় প্রমাণ। এ দলিলের প্রামাণিকতা কারও পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়া বা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ড. রাও তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছেন যে নিমজ্জিত দ্বারকা নগরীর এই ধ্বংসাবশেষে যে সমস্ত নিদর্শন মিলেছে তার সঙ্গে মহর্ষি বেদব্যাসের মহাভারতের পাতায় পাতায় কাব্যাকারে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকা পুরীর যেমন যেমন বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে তার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে।

আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে যেমন উভয়েরই অস্তিত্বের বাস্তবতা থাকে তেমনি নিমজ্জিত দ্বারকা নগরী এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বাস্তব অস্তিত্বের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। এটা অন্তত এখন আর না মেনে কোনও উপায় নেই। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ভারতের অনেক প্রাচীন গ্রন্থে, বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞান এবং সমকালীন ইতিহাসের বিপুল সম্ভার বিধৃত রয়েছে যার প্রকাশ ঘটেছে কাব্যাশ্রয়ী মনোজ্ঞ কাহিনির মাধ্যমে। বলা বাহুল্য যে কেবলমাত্র নীরস তথ্যের স্তূপ সর্বসাধারণের কাছে আগ্রহের বিষয় হতে পারে না। মহর্ষি বেদব্যাসের মতো অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্যমেধার লেখকের তা অজানা ছিল না। রামায়ণ রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকির মতো মহর্ষি বেদব্যাসও মহাভারত রচনায় বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বিধৃত করে গেছেন। এমনিতে মহাভারতের আদিপর্বে তাঁর এই গ্রন্থকে তিনি ইতিহাস হিসেবে ব্যাখ্যায়িত করেছেন। সেই সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ঘটনার সময় মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের যে অবস্থান ছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাও লিপিবদ্ধ করে গেছেন যা শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবতার অন্যতম অকাট্য প্রমাণ। সেই সূত্রে ধরে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অতি সূক্ষ্ম ম্যাথামেটিক্যাল ব্যাক ক্যালকুলেশন করে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, তিরোধান, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ইত্যাদি ঠিক করে এবং কখন হয়েছিল তা নির্ধারণ করেছেন। এরকম একজন বিশিষ্ট গবেষক হলেন পুষ্কর ভাটনগর। তার লেখা 'Dating the era of Srikrishna' শীর্ষক গ্রন্থের সন্ধান মিলেছে কানাডার টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। এর সূত্র ধরে 'Search for the historical Krishna' গ্রন্থের লেখক এন এস রাজারাম লিখেছেন, 'এখন থেকে ৫ হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ যে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন তার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।' রাজারামের এই গ্রন্থ থেকে জানা যাচ্ছে যে রামচন্দ্রের ৩২ তম উত্তরপুরুষ বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর হাতে নিহত হন এরকম ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত এই সমস্ত তথ্য এতদিন উন্মোচিত হয়নি কেন তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক নন্দিতা কৃষ্ণনের বক্তব্য হলো, হোমারের মহাকাব্য ইলিয়ড ও ওডেসি-কে অনুসরণ করে গ্রিসে ট্রয় নগরীর সন্ধানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আবিষ্কৃত সেই ধ্বংসাবশেষ পর্যালোচনা করে যখন দেখা গেল হোমারের মহাকাব্যের সঙ্গে তার প্রায় আনুপার্বিক মিল রয়েছে তখন ওই মহাকাব্যকে ঐতিহাসিক মহাকাব্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জাতীয় স্বাভিমানহীনতার কারণে ভারতে তা হয়নি। এমনকী দ্বারকা নগরী আবিষ্কারের পরেও তার রিপোর্ট কার্পেটের তলায় চাপা পড়ে অবহেলিত হয়েছে। শ্রীমতী কৃষ্ণনের মতে, গ্রিসের মতো ভারতবর্ষেও যদি যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হতো তাহলে কেবল শ্রীকৃষ্ণই নয়, মহাভারতে বর্ণিত আরও অনেক তথ্য-প্রমাণ সামনে চলে আসত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনা এতটাই সূক্ষ্ম ও নিখুঁত যে সেখানে শত-সহস্র বছরেও সামান্য এক-আধ মিনিটেরও হেরফের হয় না। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় এটা আমরা লক্ষ্য করে থাকি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাণিতিক প্রতিগণনা করে ভাটনগর তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল ৩১১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ২৭ জুলাই। কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি, শুক্রবার। জন্মমুহূর্ত রাত ১১টা ৪০ মিনিট। অর্থাৎ এখন থেকে ৫ হাজার ১৩২ বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল। ভাটনগরের গ্রন্থে উল্লেখ করা তথ্য অনুযায়ী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হয় ৩০৬৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ২২ নভেম্বর সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে এবং সেদিনটাও ছিল শুক্রবার। মহাভারতের শল্যপর্বে ব্যাসদেব লিখে গেছেন যে ওই মহাযুদ্ধের আগের দিন পুষ্যা নক্ষত্র তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের নিয়ে উপপ্লব্য থেকে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণের দিকে যাত্রা করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর। আর ৩০৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১৩ এপ্রিল, চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে উত্তরা প্রস্থাপদ নক্ষত্রে ওই পুরুষোত্তমের যখন মহাপ্রয়াণ ঘটে, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

দ্বারকা নগরীর ধ্বংসাবশেষ এবং এত সমস্ত তথ্যপ্রমাণ থেকে এই নিকর্ষে উপনীত হওয়া যায় যে, যিনি যাই বলুন না কেন, শ্রীকৃষ্ণের কীর্তির নিদর্শন আরব সাগরে সলিলসমাধি ঘটা 'সুবর্ণনগরী দ্বারকা'-সহ অপরিমেয় কীর্তি সমূহের জন্যই তাঁর ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়ে এখন আর সন্দেহ প্রকাশ করা কিংবা প্রশ্ন তোলার কোনও অবকাশ নেই।

মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থের সন্ধানে দিল্লিতে উৎখনন চালানোর পর খ্যাতনামা ঐতিহাসিক তথা প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে সর্বমান্য পুরাতত্ত্ববিদ ড. ব্রজবাসী (বি বি) লাল ১৯৫৫ সালে যে তাক লাগানো মন্তব্য করেছিলেন তা উদ্ধৃত করে এই নিবন্ধের ইতি টানা যাক। সেই মন্তব্য হলো, 'Combind evidences of archaedogy and literature establishes the historisety of Mahabharata... everything in the epic is true.'— গ্রন্থ ও পুরাতত্ত্বের সাযুজ্য মহাভারতকে প্রামাণ্য ইতিহাস হিসেবে প্রস্থাপিত করছে। '...মহাভারতে যা কিছু লেখা আছে তা সবই সত্যি।' শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাভারতেরই কেন্দ্রীয় ব্যক্তি।

(শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

শায়রার টুপি—স্বনির্ভরতার প্রতীক

সুতপা বসাক ভড়

জীবনের পথ চলতে চলতে আমরা বিভিন্ন বাঁকের সম্মুখীন হই। বাঁকগুলি আমাদের জীবনে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। সঠিক, ইতিবাচক এবং আশাবাদী সিদ্ধান্ত আমাদের ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে চলে সাফল্যের দিকে। সেই পথ তখন শুধুমাত্র একজনের জীবনের আলো জ্বেলে দেয় না, সেই প্রদীপটি আলোকিত করে সমাজের আরও অনেক মানুষকে। উপকৃত হয় আশপাশের ব্যক্তি ও সমাজ। এমনই ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের রুস্তমপুর সহসপুর নিবাসী শায়রার সঙ্গে।

প্রায় বছর দুয়েক আগেকার কথা। রুস্তমপুর সহসপুরের মোবিন ছিল একজন বেকার যুবক। পত্নী শায়রা সেলাইকর্মে নিপুণা, অথচ কট্টর সমাজব্যবস্থার জন্য কিছু করতে পারছিল না। তারপর একসময় মোবিন ওই সব কুপ্রথা মানসিকতা অতিক্রম করে। সে পঁচিশ হাজার টাকা জোগাড় করে পত্নী সায়রাকে টুপি সেলাইয়ের কাজ উৎসাহিত করে। গ্রামের আরও কিছু মহিলাও এতে যোগদান করেন। বর্তমানে ষাট জন মহিলা এই কাজে জুড়ে নিজের নিজের পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে চলেছেন।

শায়রার কর্মকুশলতা এককটি পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে। তাঁর বানানো টুপি বিদেশেও পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের টুপি থেকে শুরু করে গান্ধী-নেহেরু টুপি পর্যন্ত বানিয়ে শায়রা অন্যদের পথপদর্শকরূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করে তুলেছে। শায়রার দলভুক্ত মহিলারা বাড়িতে বসেই প্রতিদিন দুশো টাকার মতো উপার্জন করে। এই কাজকে আরও সুচারুভাবে করার জন্য সায়রা দশজন করে মহিলাদের ভাগ করে প্রত্যেক দলকে পৃথক পৃথক কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। একটি দল সারাদিনে এক হাজার টুপি বানিয়ে ফেলে। দলে পুরুষেরাও আছেন, তাঁরা টুপির কাপড় কেটে দেন, এরপর মহিলারা সেটি সেলাই করেন। কাপড় কাটা, সেলাই করা এবং প্যাকিং-এর কাজ পৃথক পৃথক দল করে থাকে। বিশেষ বিশেষ সময়, যেমন নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, ভোটের সময় এসব টুপির চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। এই কাজে মহিলাদের নেত্রী হলেন শায়রা। যেসব মহিলা নিজের বাড়ি থেকেই টুপি বানান, তাঁদেরও কাজের দেখাশুনা করেন সায়রা নিজে। শায়রা জানিয়েছেন, ঘরের মহিলারা বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে, ঘরের কাজ শেষ করে তারপর টুপি বানাতে বসেন।

রুস্তমনগর মহমপুরে তৈরি হওয়া টুপি দিল্লি হয়ে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছে। বাংলাদেশ থেকেও শায়রার টুপির অর্ডার আসে। এছাড়া ভারতের মধ্যে উত্তরাখণ্ড থেকে হলদোয়ানি, বাগেশ্বর, আলমোড়া, মুর্শিয়ারী, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি জায়গাতে বিলোরির টুপির খু চাহিদা। দিল্লির সদর বাজার এবং ঝণ্ডেওয়ালি গলি থেকেও ব্যবসায়ীরা শায়রার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন করে থাকেন।

একসময় বেকার, দরিদ্র ছিলেন সায়রা। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটু পৃথক ও স্বাধীন চিন্তাধারা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছে। চলার পথে গ্রামের আরও অনেক মহিলাকে আর্থিকভাবে সশক্ত করতে সাহায্য করেছে। কট্টরপন্থী সমাজ ব্যবস্থার বাধা ভেঙে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে চলছেন শায়রা এবং তাঁর দল। ▮

With Best Compliments from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

With Best Compliments From :

emami

EMAMI PAPER MILLS LIMITED

AN ISO 9001 : ISO 14001 : 0HSAS 18001 CERTIFIED COMPANY

Manufacturers of

International Quality Packaging Board

Coated Grey Back Board, Folding Box Board and SBS Board (White)

High Quality White and Pink Newsprint

S. S. Maplitho, Writing & Printing and Ledger Paper.

✸ ✸ ✸

Registered Office :

1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, ACROPOLIS, Unit No. -1
15th Floor, Kolkata - 700 107, (West Bengal)
Phone : 6627-1300/1301, Fax : (033) 6627-1338
E-mail : emamipaper@emamipaper.com
Website : www.emamipaper.in

FOR BUSINESS ENQUIRY - CONTACT :
Mr. Soumyajit Mukherjee, Vice President (Marketing and Sales),
Mob. +91 9051575554, E-mail : soumyajit@emamipaper.com

Unit Gulmohar
R. N. Tagore Road
Alambazar, Dakshineswar
Kolkata - 700 035 (West Bengal)
Phone : 2564-5412/5245/ 65409610-11
Fax : (033) 2564-6926
E-mail : gulmohar@emamipaper.com

Unit Balasore
Vill. - Balgopalpur
P. O. Rasulpur,
Dist. - Balasore (Odisha) - 756 020
Phone : (06782) 275-723/779
Fax : (06782) 275-778
E-mail : balasore@emamipaper.com

SURYA

Energising Lifestyles

Innovative **DESIGN** » World-Class Quality **PRODUCTS** » Just One Name **SURYA**

lighting

fans

appliances

pipes

SURYA ROSHNI LIMITED

E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in

Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96

Toll Free No.: 1800 102 5657

/suryalighting I /surya_roshni

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

CHOOSE THE BEST

DURO®

LIFETIME GUARANTEE FROM INSECT INFESTATION

TRIPLE HEAT TREATED

DOUBLE CALIBRATED TECHNOLOGY

MADE FROM MATURE AND SUSTAINABLE RAW MATERIAL

LOW EMISSION CONFORMING TO E1 GRADE

The Forest Friendly Company

Duroply Industries Limited

BLOCK BOARD • PLYWOOD • VENEERS • DOORS

113 Park Street, North Block, 4th Floor, Kolkata 700016 | **P:** (033) 2265 2274 | **Toll Free:** 1800 345 3876(DURO)

Email: corp@duroply.com | **Website:** www.duroply.in | **Find us on** duroplyindia